ফিলিস্তিন বনাম জায়নবাদ

লড়াই ও লিগ্যাসি

মুসা আল হাফিজ

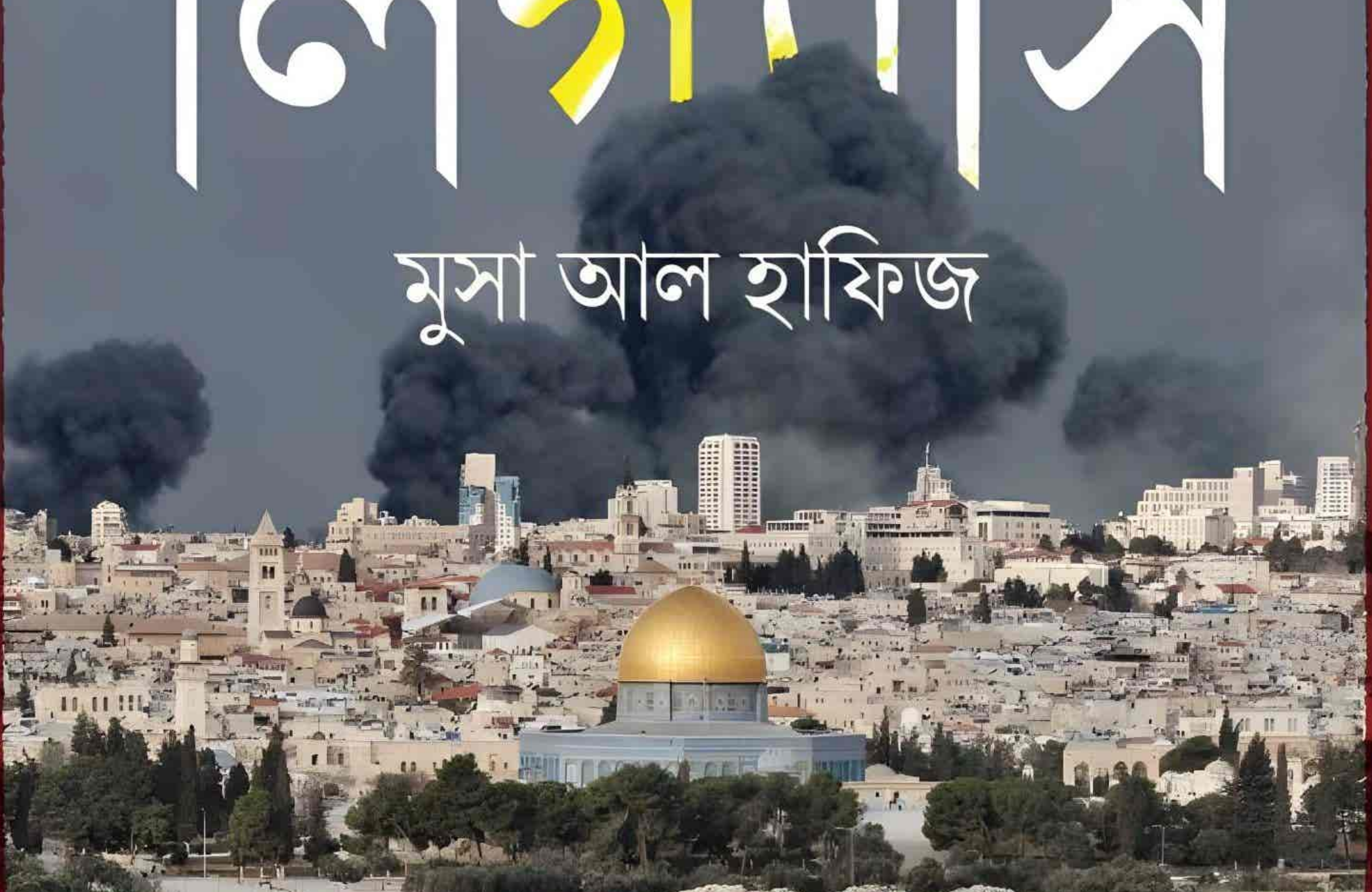

ফিলিস্তিন

ব না ম

জায়নবাদ

লড়াই ও লিগ্যাসি

ফিলিস্তিন বনাম জায়নবাদ

লড়াই ও লিগ্যাসি

মুসা আল হাফিজ

ইলহাম

ফিলিস্তিন বনাম জায়নবাদ: লড়াই ও লিগ্যাসি

মুসা আল হাফিজ

প্রকাশক

ইলহাম

৩/১-এইচ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রকাশকাল

অগ্রহায়ণ ১৪৩০

নভেম্বর ২০২৩

প্রচ্ছদ

আল নোমান

মুদ্রণ

ক্রিয়েটিভ প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং

PHILISTIN BONAM JAYONBAD : LORAI O LEGACY by Musa Al Hafiz

Published by Ilham

Date of Publication : November 2023

E-mail : ilhampublications@gmail.com

Copyright © 2023 Author

All rights reserved. Any form of reproduction whether in printed or digital or by any other means. Without written permission from the publisher is protected by law and Divine regulation. The violator will be subjected to local law and will be sued.

সূচি

প্রাচীন সেই নগর ৭
কানানিদের কৃতিত্ব ৮
আমালিকা ও অন্যরা ১০
ইহুদি কারা? ১২
ইহুদিদের ফিলিস্তিন জয় ১৩
ফিলিস্তিনে ইহুদি শাসন ১৬
জেরুসালেমে আক্রমণ ও লুণ্ঠন ১৭
প্রথম ধ্বংসযজ্ঞ, প্রথম নির্বাসন ১৮
বিভক্তি ও যিশু বিরোধিতা ১৯
চূড়ান্ত উচ্ছেদ ২১
ইসলামের নিরাপত্তায় ফিলিস্তিন ২৪
ক্রুসেডারদের তাণ্ডব ২৬
ইউরোপের কালো দিনগুলো ২৮
প্রতিশ্রুত ভূমি : ন্যায্যতা-অন্যায্যতা ৩৩
মানুষহীন ভূমি ও ভূমিহীন মানুষ ৩৭
ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইহুদিদের ঐতিহাসিক দাবি ৪০
জায়নবাদ ৪১
জায়নবাদ বিরোধী ইহুদি ৪৩
উপনিবেশ তৈরির যাত্রা ৪৪
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ৪৬
সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ৪৮
প্রতিরোধ আন্দোলন ৪৯
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর ৫২
ইসরাইল রাষ্ট্রের সূচনা ও নাকবা ৫৩

দুই রাষ্ট্রতত্ত্ব ৫৫
আরবদের ভূমিকা ৫৭
ছয়দিনের যুদ্ধ ৬০
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ৬১
পিএলওর বিবর্তন ৬২
ইন্তিফাদা ও হামাস ৬৩
ফিলিস্তিনিদের গণকবর কিংবা বন্দিশালা.......... ৬৫
গণহত্যার লাইসেন্স ৬৭
গ্রেটার ইসরাইল, টেম্পল মাউন্ট ও ৭ অক্টোবর ..৬৯
পশুতত্ত্ব ও বর্ণবাদ ৭২
এই যে ধ্বংসযজ্ঞ, এটা কি পাশবিকতা নয়? ৭৩
বর্বরতা ও বেঁচে থাকা ৭৫

প্রাচীন সেই নগর

খ্রিষ্টপূর্ব ১১ হাজার বছর আগের ফিলিস্তিন। ভূমধ্যসাগর ও জর্দান নদীর মাঝখানে ছোট ছোট জনপদে জাগলো নতুন উদ্যম। কৃষিভিত্তিক লোকালয়গুলো তৈরি করছে প্রাণমুখর জীবনযাত্রা। ধীরে ধীরে সেখানে জন্ম নিলো শহর-নগর। জর্দান উপত্যকায় প্রচুর ফুল-ফল আর সবুজের বিস্তার। এখানে সুগন্ধিরও চাষ হয়। মানুষ আসে সুগন্ধির মায়ায়। মানুষ আসে ফসলের প্রয়োজনে। মানুষ আসে শীতল ছায়া আর জলধারার আমন্ত্রণে।

এখানকার অধিবাসীরা সুগন্ধিকে বলে রাহা। সুগন্ধিবৃক্ষ, জলপাই বন আর খেজুর গাছের ছায়াঘন বাগান। জমি ছিল উর্বরা, ঝরনায় ছিল মাতৃদুগ্ধ আর মাটিতে ছিল প্রসন্ন আশ্বাস। ধীরে ধীরে তারা এখানে গড়লো ব্যবসাকেন্দ্র। সুগন্ধিকে ঘিরে জন্ম নেওয়া এ কেন্দ্রের নাম হলো আরিহা। এখানে অনেকেই একত্ববাদী বটে। তবে বহু লোক চাঁদের উপাসনা করে। তারা তৈরি করে চন্দ্রদেবতা। চাঁদকে তারা বলত ইরাহা, দেবতার নাম দিলো ইরিক। শহরটির চারদিকে খেজুর গাছ। ফলে এর আরেক নাম হলো জেরিকো। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শহর।[১]

প্রত্নতাত্ত্বিকরা জেরিকোতে পরপর ২০টিরও বেশি বসতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন, যার মধ্যে প্রথমটি খ্রিষ্টপূর্ব ৯০০০ থেকে ১১০০০ বছর আগের।[২] যদিও বাইবেলীয় কালগত হিসাব এই দাবির সাথে সাংঘর্ষিক।

---

১ Gates, Charles (2003). "Near Eastern, Egyptian, and Aegean Cities", Ancient Cities: The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome. Routledge, p .18

২ Akhilesh Pillalamarri (18 April, 2015), "Exploring the Indus Valley's Secrets". The Diplomat

কানানিদের কৃতিত্ব

কারা নির্মাণ করেছিল এই সভ্যতা? এর নির্মাতারা ছিলেন কানানীয়। আরদে কানান বা কানান অঞ্চলজুড়ে বাস করত তারা। এরা ছিল বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী। যাদের কেউ কেউ স্থায়ী বাসিন্দা ছিল, কেউ কেউ ছিল যাযাবর মেষপালক।

বাইবেলের দাবি, কানানিরা ছিলেন নুহ আ.-এর পৌত্র কানান ইবনে হাম-এর বংশধর। প্রাচীন ফিলিস্তিনি সভ্যতা মূলত কানানিদের সভ্যতা। কানানিদের একটি অংশ লেবাননে বসতি গড়ে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ থেকে লেবানন ও ভূমধ্যসাগরের মাঝামাঝি অঞ্চলে সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে তারা। রক্তিম বর্ণের কারণে গ্রিকরা তাদের বলত ফিনিশীয় বা লাল রঙের মানুষ।

খ্রিষ্টপূর্ব তেরো শতকে আরব সীমান্ত অঞ্চলের বহু লোক ফিলিস্তিনে আসে। তারা মূলত ছিল কানানি আরব। তাদের অন্যতম গোত্র ছিল জেবুসি। ফিলিস্তিনে এ গোত্রের প্রথম সর্দার মালিক সাদিক। তার উপাধি ছিল সালেম। তার নামের স্বাক্ষর আছে জেরুসালেম নগরীর নামে, তিনিই শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে এর আরেক নাম ছিল জেবুস। শহরটি জেবুসিদের প্রধান কেন্দ্র ও রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের আগে কানানিরা এর গোড়াপত্তন করে।

কানানিদের একটি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ছিল, যা তাদের শিল্প, স্থাপত্য এবং ধর্মীয় অনুশীলনে প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের প্রধান অংশটি হজরত নুহ আ.-এর দ্বীনের অনুসরণ করত। পরবর্তীতে মূর্তিপূজা প্রচলিত ও বিস্তৃত হয়। তাদের সভ্যতা সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন ছিল হিব্রু-ইসরাইলিদের তরফে। তাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য জেবুসিরা জিয়ন পাহাড়ের ওপর শহরের প্রতিরক্ষাদুর্গ তৈরি করে। ইসরাইলিদের আক্রমণ

প্রতিহত করার জন্য খ্রিষ্টপূর্ব ১৫৫০ অব্দে মিসরের প্রথম ফেরাউন তাহতামেসের সাথে তারা মৈত্রীচুক্তি করে। জেরুসালেম ও নিকটবর্তী অঞ্চলে তারা গড়ে বহু দুর্গ। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রমাণ করেছে, দুর্গগুলো খ্রিষ্টপূর্ব আঠারো শতকের আগেই নির্মিত হয়েছিল।[৩]

বাইবেল তাদের প্রসঙ্গে মুখর। বাইবেলে সর্বাধিক ব্যবহৃত জাতিগত শব্দ হলো কানানি।[৪] বনি ইসরাইল জাতির জন্মের সহস্র বছর আগ থেকে তারা বসবাস করছিল ফিলিস্তিনে। সেখান থেকে তাদেরকে অনেকেই চেয়েছে উচ্ছেদ করতে।

যিহোশুয়ের পুস্তকে কানানিদের নির্মূল করতে সচেষ্ট বিভিন্ন জাতির তালিকা রয়েছে।[৫] বাইবেলের মতে অবশেষে তারা পরাজিত হয় ইহুদিদের হাতে।

---

৩ ড. জিয়াউর রহমান আজমী, দিরাসাত ফিল ইয়াহুদিয়্যাহ ওয়াল মাসিহিয়্যাহ ওয়া আদইয়ানিল হিন্দ, পৃ. ৪২-৪৪, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ।

৪ Dever, William G. (2006). Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From? Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 219

৫ Joshua, 1-12

আমালিকা ও অন্যরা

বস্তুবাদী ঐতিহাসিক বয়ানে প্যালিওলিথিক যুগের ধারণাটি বিখ্যাত। বাংলায় যাকে বলে পুরা-প্রস্তর যুগ বা আদিম প্রস্তর যুগ। প্যালিওলিথিক যুগ বলতে সেই সময়কালের ইতিহাসকে বোঝায়, যখন মানুষ প্রাথমিক পাথরের যন্ত্রপাতি বানাতে শুরু করেছিল।[৬]

প্যালেস্টাইনের ইতিহাস প্যালিওলিথিক যুগের। হাইফার কারমেল পর্বতের গুহাগুলো প্রাচীন মানুষের উপস্থিতির ঘোষণা করছে। খ্রিষ্টপূর্ব ১২,০০০ অব্দে এখানে বিকশিত হয় নাটুফিয়ান সংস্কৃতি। যা কৃষির সমৃদ্ধি ঘটায় এবং সমৃদ্ধ জীবনধারাকে বিকশিত করে।

জর্দান উপত্যকায় কৃষক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। উর্বর জমি এবং পানির সহজলভ্যতা সেখানে কৃষি উন্নয়নকে সহজতর করেছে। এখানে কানানিদের ছাড়াও বসবাস করত হিভাইট, জেবুসাইট, এমরাইট, হিট্টাইট, পেরিসাইটরা। তারা পৌত্তলিক ছিল এবং বা'ল, আশের ইত্যাদি দেবতার পূজা করত। এরা বিয়ে ও সামাজিক সম্পর্কে কানানিদের সাথে মিশে গিয়েছিল। এখানে আরেকটি প্রধান গোত্র ছিল আমালিকা। তারা ছিল নিখাদ আরব। ফিলিস্তিনের মধ্যভূমি ও দক্ষিণাঞ্চলে ছিল তাদের বসবাস। ইসাকা ও রিবিকার যমজ সন্তান ছিলেন ঈসু ও জেকব।[৭]

আব্রাহাম যখন ১৭৫ বছর বয়সে মারা যান, তখন এই যমজ সন্তানদের বয়স পনেরো বছর। ঈসুর বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন তিনি কানান

---

৬ Christian, David (2014). Big History: Between Nothing and Everything. New York, New York: McGraw Hill Education, p. 93

৭ জেনেসিস, ২৫ : ২৬

দেশের দুজন আরব মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। ড্যানিয়েল জে. এলাজারের মতে, এই এক কাজই চিরকালের জন্য ঈসুকে পিতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার থেকে বাতিল করে দেয়। বিদেশি স্ত্রী গ্রহণের অর্থ ছিল তার সন্তানদের আব্রাহামিক বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা।[৮]

প্রাচীন ইসরাইলীয় গ্রন্থাবলি দাবি করে, ঈসুর সেই কানানি স্ত্রীদের বংশধররা হলো আমালিক। যেহেতু জেকবের সাথে ঈসুর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছিল, তাই জেকবের বংশধর ইসরাইলিদের সাথে আমালিকাদের দ্বন্দ্ব জারি ছিল। আমালিকরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। ফিলিস্তিনে তারাও গড়ে তুলেছিল বহু শহর-জনপদ। ইহুদিদের সাথে ছিল তাদের সংঘাত।

৮ Elazar, Daniel J. (n.d.). "Jacob and Esau and the Emergence of the Jewish People". Jerusalem Center for Public Affairs

ইহুদি কারা?

বনি ইসরাইল মানে ইসরাইলের বংশধরগণ। ইসরাইল হলো হজরত ইয়াকুব আ.-এর অপর নাম। তিনি ছিলেন ইবরাহিম আ.-এর নাতি ইসহাক আ.-এর পুত্র। হজরত ইয়াকুব আ.-এর ছিলেন চারজন স্ত্রী।

প্রথম স্ত্রী লাইয়াহ। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হজরত ইয়াকুব আ.-এর ছয়জন ছেলে। তারা হলেন : ১. রাউবান, ২. শামউন, ৩. লাভি, ৪. ইয়াহুদা, ৫. আশকার, ৬. যাবলুন।

দ্বিতীয় স্ত্রী বালহা। তার সন্তান দুজন। তারা হলেন : ১. দান, ২. নাফতানি।

তৃতীয় স্ত্রী যুলফা। তার সন্তান ২ জন : ১. জাদ, ২. আশির।

চতুর্থ স্ত্রী রাহিল। তার পুত্র দুজন। ১. ইউসুফ আ., ২. বিনইয়ামিন।

এই সন্তানদের সকলেই ছিলেন বনি ইসরাইল। এদের মধ্যে লাইয়ার চতুর্থ ছেলে হলেন ইয়াহুদা বা ইয়াহুজা। অনেকের মতে, তার বংশধররা হলেন ইহুদি। প্রকৃত অর্থে বনি ইসরাইলের সবাই ইহুদি নন, তাদের একটা অংশ ইহুদি।

ইয়াহুদা শব্দের অর্থ তওবাকারী। গরুর বাছুরপূজা থেকে তাওবা করার কারণে তার নাম হয়েছে ইয়াহুদা, অর্থাৎ তওবাকারী।[৯]

---

৯ কুরতুবি : ১/৩৩৮

ইহুদিদের ফিলিস্তিন জয়

ইসরাইলিরা কানানীয়দের হাত থেকে ফিলিস্তিনি ভূমি দখলে নিয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১২২০ অব্দে। তারা শুরুতে এসেছিল মেসোপোটেমিয়া থেকে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দের দিকে দুর্ভিক্ষের সময় ইসরাইলের ১২টি গোত্র মিসরে অভিবাসন করে। প্রথমে তারা মিসরে সমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তাদের অবস্থার অবনতি ঘটে, তারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়। সবশেষে খ্রিষ্টপূর্ব ১২৫০ অব্দের দিকে তারা মুসেজের নেতৃত্বে মিসর থেকে পালিয়ে গিয়ে সিনাই উপদ্বীপে যাযাবর জীবনযাপন করতে থাকে। তবে তারা একে তাদের স্থায়ী সমাধান মনে করেনি। কারণ তারা নিশ্চিত ছিল, ঈশ্বর যিহোবা তাদেরকে কেনানের উর্বরা ভূমির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইসরাইলিরা প্রতিশ্রুত ভূমিতে পৌছার আগেই মুসেজ মারা যান। তবে ইতোমধ্যে তারা জেনে গেছে, কেনান দেশটি ভালো দ্রব্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ। এখানে এমন কিছু ফল আছে যা ওখানে ফলে।

কিন্তু ওখানে যারা বসবাস করে তারা খুবই শক্তিশালী। শহরগুলো খুবই বড়। খুবই মজবুতভাবে সেগুলো সুরক্ষিত।[১০]

অবশেষে যশুয়ার অধীনে গোত্রগুলো বলপূর্বক কেনানে ঢুকে পড়ে, ঈশ্বরের নামে তরবারির সাহায্যে দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।[১১]

পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করে তিনি গিলগিল ও এর সামনের অয় নগরী দখল করেন। তার আদেশে নগরীর ১২ হাজার নারী-পুরুষের সবাইকে হত্যা

---

১০ গণনাপুস্তক, ২৭ : ২৮

১১ কারেন আর্মস্ট্রং: জেরুসালেম : ওয়ান সিটি থ্রি ফেইথ, ইসরাইল, হাসান শরীফ অনূদিত, অন্যধারা, বাংলাবাজার ঢাকা

করা হয়। অয় নগরী জ্বালিয়ে চিরদিনের জন্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়।[১২] অয় নগরীর সম্রাট সন্ধি ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু যশুয়া তাকে হত্যা করে সন্ধ্যা অবধি কাঠে ঝুলিয়ে রাখলেন। সন্ধ্যা নামলে মৃতদেহটি নামিয়ে নগর ফটকে (বাইরে) ফেলে দেওয়া হয়।[১৩]

যশুয়া জয় করেছিলেন পার্বত্যাঞ্চল, নেগেভ, নিম্নভূমি, পাহাড়ি এলাকা এবং তাদের সব রাজাকে পরাভূত করেছিলেন। মাত্র সাত বছরে তিনি একত্রিশজন রাজাকে পরাজিত করেন। এদের একজনকেও তিনি জীবিত রাখেননি। তবে গাজা ও জাফা-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে তিনি প্রতিরোধের মুখোমুখি হন। কেননা এখানকার অধিবাসীরা ছিল ভয়ানক যোদ্ধা। তাদের অস্ত্রও ছিল উন্নত। যশুয়া তাদের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে গিলগিলে ফিরে যান। ইহুদিদের ১২টি গোত্রের সবাইকে অধিকৃত কেনানের একটি করে অংশ বরাদ্দ করা হয়। তারা কানানি অঞ্চলে নিষ্ঠুরতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যাকেই পেয়েছে, হত্যা করেছে। সমস্ত নারীকে দাসী বানিয়েছে। রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে। শহরের বাসিন্দাদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে। শহর পুড়িয়ে ছাই বানিয়েছে। দাবি করেছে, তাদের সব কাজই ন্যায্য। কারণ তা মুসেজের আদেশে, ঈশ্বরের আদেশে।[১৪]

সম্প্রতি ইহুদিবাদীদের অনেকেই দাবি করেন, ইসরাইলিরা আসলে বহিরাগত ছিল না। তারাও কানানি। এ দাবি বাইবেলের সাথে সংঘাতমূলক। ইসরাইলিরা যদি কানানিই হয়ে থাকে, তবে কেন বাইবেলে এত জোর দিয়ে বলা হলো যে ইসরাইলিরা বহিরাগত?

যশুয়া কানানি ভূমি জয় করেছিলেন বটে। তবে বিজয়টা সামগ্রিক ছিল না। বাইবেল লেখকরা বলছেন, তিনি কানানি নগর-রাষ্ট্রগুলোকে পরাজিত করতে পারেননি, তিনি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে কোনো সাফল্য পাননি। তার বেশির ভাগ পদক্ষেপ বেনিয়ামিন ভূখণ্ডের খুবই ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ

১২ বুক অব যশুয়া, ৮ : ২৮-২৯

১৩ বুক অব যশুয়া, ৮ : ২৯

১৪ উইল ডুরান্ট, দ্য স্টোরি অব সিভিলাইজেশন, ১৯৩৯ : ২/২২৬

ছিল। বস্তুত বাইবেল আমাদের মধ্যে বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করে যে যশুয়ার বিজয় বড় ধরনের কিছু ছিল না।[১৫]

'জুদার ছেলেরা জেরুসালেমে বসবাসকারী জেবুসিদের (আরব কানানি) তাড়িয়ে দিতে পারেনি' বলে স্বীকার করে নিয়েছে বাইবেল। জেবুসিরা জুদার সন্তানদের পাশাপাশি জেরুসালেমে বাস করতে থাকে, ঠিক এখন তারা যেভাবে বাস করছে।[১৬]

তাদের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল কঠিন পরিস্থিতি। ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের ভাষায়– যশুয়ার মতো উগ্র উদ্দীপনা অন্য কারো ছিল না। তাকে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন কানানি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সব বেদি ও ধর্মীয় প্রতীক সমূলে উচ্ছেদ করার। পরে এটিই হয়ে পড়ে ইসরাইলি আদর্শ।[১৭]

ইহুদিরা পুরো ফিলিস্তিন কখনো দখল করতে পারেনি। ফিলিস্তিনিরাও কখনো তাদের দখলদারি মেনে নেয়নি।

---

১৫ কারেন আর্মস্ট্রং : জেরুসালেম : ওয়ান সিটি থ্রি ফেইথ, ইসরাইল, হাসান শরীফ অনূদিত, অন্যধারা, বাংলাবাজার ঢাকা

১৬ প্রাগুক্ত।

১৭ প্রাগুক্ত।

ফিলিস্তিনে ইহুদি শাসন

খ্রিষ্টপূর্ব তেরো শতকে ইসরাইলিরা এ অঞ্চলে প্রবেশ শুরু করে। স্থানীয়দের পরাজিত ও হত্যা করে ইহুদিরা। গঠন করে রাষ্ট্র। প্রথম রাজা হন কিং সল বা তালুত। তালুত লড়াই করেছিলেন আমালিকদের বিরুদ্ধে। তাদের সেনাপতি গোলিয়াথকে হত্যা করেন বেথেলহেমের জেসির ছোট ছেলে ডেভিড। সল-এর পরে রাজা ডেভিড জেরুসালেম শাসন করেন এবং একে ইসরাইল রাজ্যের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮]

প্রাথমিকভাবে, দাউদ শুধুমাত্র ইয়াহুদা গোত্রের রাজা ছিলেন এবং ইবরান থেকে শাসন করেছিলেন, কিন্তু সাড়ে সাত বছর পর, অন্যান্য বনি ইসরাইলীয় উপজাতি তাকে তাদের রাজা হিসেবে মেনে নেয়।[১৯] কিং সলোমন হন ডেভিডের পরবর্তী রাজা।[২০] তার নেতৃত্বে ইসরাইলি রাষ্ট্র চূড়ান্ত বিকাশ ও প্রতিপত্তি লাভ করে। তালমুদ অনুসারে সলোমন ইহুদি ধর্মের ৪৮জন নবীর অন্যতম।[২১]

কিং সলোমনের মৃত্যুর পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৯৩০ অব্দে তার পুত্র রেহোবামের সময় ইসরাইলি রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তরের অংশ ইসরাইল, দক্ষিণের অংশ জুদাহ।

উভয় রাজ্যই প্রতিবেশীদের সাথে দ্বন্দ্বে ছিল জর্জরিত। অ্যাসিরীয় এবং ব্যাবিলনীয়দের সাথে চলছিল ধারাবাহিক উত্তেজনা।

---

১৮ ১ স্যামুয়েল, ৫ : ৬-৭ : ৬

১৯ Mandel, David. Who's Who in the Jewish Bible. Jewish Publication Society, 1 Jan 2010, p. 85

২০ Book of Kings: 1 Kings 1-11; Books of Chronicles: 1 Chronicles 28-29, 2 Chronicles 1-9

২১ Rashi, to Megillah, 14a

জেরুসালেমে আক্রমণ ও লুণ্ঠন

প্রতিবেশী রাজ্যগুলো সুযোগ পেলেই চড়াও হতো ইসরাইলি রাজ্যের ওপর। সলোমনের মন্দির বেশ কয়েকবার লুণ্ঠিত হয়েছিল। রহবিয়ামের রাজত্বের পঞ্চম বছরে (সাধারণত ৯২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে) মিশরীয় ফারাও শিশক (ইতিবাচকভাবে প্রথম শোশেঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত) মন্দির ও রাজার বাড়ির ধনসম্পদ আর সলোমনের তৈরি সোনার ঢালগুলো নিয়ে যায়; রহবিয়াম সেগুলোকে পিতলের ঢাল দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে।[২২]

এক শতাব্দী পরে ইসরাইলের উত্তর রাজ্যের রাজা যিহোয়াশ জেরুসালেমের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রাচীরের একটি অংশ ভেঙে দেন এবং মন্দির ও প্রাসাদের ধনসম্পদ নিয়ে যান।[২৩]

অন্য একটি জটিল সন্ধিক্ষণে হিষ্কিয় মন্দিরের দরজা এবং দরজার চৌকাঠ থেকে সোনা কেটে ফেলেছিলেন এবং এগুলো রাজা সেনাখেরিবকে দিয়েছিলেন।[২৪] বাইবেলে আছে ব্যাবিলনীয় রাজা যিহোয়াখিনের কথা। তিনি তার সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে ৫৯৮ খ্রিষ্টপূর্বে জেরুসালেম আক্রমণ করেছিলেন।[২৫] এ সময় নব্য-ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় নেবুচাদনেজার দ্বারা মন্দিরটি লুণ্ঠিত হয়।

---

২২ ১ রাজাবলি, ১৪ : ২৫; ২ বংশাবলি, ১২ : ১-১২

২৩ ২ রাজাবলি, ১৪ : ১৩-১৪

২৪ ২ রাজাবলি, ১৮ : ১৫-১৬

২৫ রাজাবলি, ২৪ : ১৩

প্রথম ধ্বংসযজ্ঞ, প্রথম নির্বাসন

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৮ অব্দে নেবুচাদনেজার আবারো জেরুসালেম ঘেরাও করেন। ৩০ মাস পরে অবশেষে ৫৮৭/৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শহরের প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬/৭ অব্দে শহরটি তার সেনাবাহিনীর হাতে আসে। এক মাস পরে তিনি কমান্ডার নেবুজারাদানকে পাঠান শহরটিকে পুড়িয়ে ফেলা এবং ধ্বংস করার জন্য। বাইবেল জানায় 'সে ইয়াহওয়েহের মন্দির, রাজপ্রাসাদ ও জেরুসালেমের সমস্ত বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।'[২৬] লুণ্ঠনযোগ্য সমস্ত কিছু তখন সরিয়ে নিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[২৭] ঐতিহাসিক জোসেফাসের মতে মন্দিরটি পোড়ানো হয় নির্মিত হওয়ার চারশত সত্তর বছর ছয় মাস, দশ দিন পরে।

ব্যাবিলনীয়রা জীবিত ইহুদিদেরকে বিতাড়িত করে ফিলিস্তিন থেকে। ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানের স্রষ্টা নেবুচাদের হাত দিয়েই শুরু হলো ধারাবাহিক উদ্বাস্তু ইহুদি সমস্যা। বাইবেলে দানিয়েলের পুস্তকে রাজা নেবুর আলোচনা রয়েছে। নেবুর হাতে উচ্ছেদ হবার ৫০ বছর পরে পার্শিয়ান রাজা সাইরাস এ অঞ্চল জয় করেন, ইহুদিদের আবারো জেরুসালেমে ফেরত আসতে দেন এবং ৫১৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নতুন করে মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটি ৫৮৫ বছর টিকে ছিল। রাজা হেরোডের আমলে দ্বিতীয় মন্দিরটি নতুন করে সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করা হয়। এর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল আনুমানিক ৫১৬ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে আনুমানিক ৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

---

২৬ রাজাবলি, ২৫ : ৯

২৭ ২ রাজাবলি, ২৫ : ১৩-১৭

বিভক্তি ও যিশু বিরোধিতা

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ অব্দে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট জেরুসালেমের নিয়ন্ত্রণ নেন। এর মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির প্রবর্তন ঘটে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর, ফিলিস্তিন টলেমি এবং পরে সেলিউসিডদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

গ্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইহুদি ধর্ম বদলাতে থাকে। নতুন শাখা তৈরি হয়। যাদের বলা হতো হেলেনিস্টিক ইহুদি। গ্রিক সংস্কৃতির অনুকারী এই ধারাকে পথভ্রষ্ট মনে করা হতো।

খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩ অব্দে জেরুসালেম দখল করেন রোমান জেনারেল পম্পেই। একে রোমের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করেন। রোমান সংসদ হেরোড দ্য গ্রেটকে বানায় এ অঞ্চলের রাজা। ইহুদিদের প্রতি সদয় ছিলেন তিনি।[২৮]

কিন্তু তখন ইহুদিদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের চরম দুর্দিন। তাদের সংশোধন ও পথনির্দেশের জন্য আগমন করলেন যিশুখ্রিষ্ট। তিনি ইহুদি র‍্যাবাইদের দুর্নীতির প্রতিবাদ করেন। একত্ববাদের শিক্ষা দেন। ইহুদিরা

---

২৮ De Souza, P., Piracy in the Graeco-Roman World, Cambridge University Press, 2002

তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলো। রোমান রাজাকে লেলিয়ে দিলো তার বিরুদ্ধে। ইহুদি বিচারকরা বিচারের নামে তার হত্যার আয়োজন করে।[২৯]

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস মতে এরপর পন্থিয় পিলাতের আদেশে যিশুকে ক্রুশে মেরে ফেলা হলো।[৩০]

---

২৯ Sanders, Ed P. (1993). The Historical Figure of Jesus. Allen Lane Penguin Press, p. 11

৩০ Allison, Dale C.; Crossan, John D. The Historical Jesus in Context. Princeton Univ Press. p. 4

চূড়ান্ত উচ্ছেদ

৩৩ খ্রিষ্টাব্দে যিশুখ্রিষ্ট ঘোষণা করেন– জেরুসালেম আসন্ন এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি।

তিনি বলেন : 'তোমার ওপরে এমন সময় উপস্থিত হবে, যে সময়ে তোমার শত্রুরা তোমার চারধারে জাঙ্গাল বাধবে, তোমাকে বেষ্টন করবে, তোমাকে চারদিক থেকে অবরোধ করবে এবং তোমাকে ও তোমার মধ্যবর্তী অনুসারীদের ভূমিসাৎ করবে, তোমার মধ্যে পাথরের ওপর পাথর থাকতে দেবে না।'[৩১]

যিশুর কথা কি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল? তা হয়েছিল রোমানদের দ্বারা। তেত্রিশ বছর ধরে ইহুদি রাজ্যের সাথে রোমানদের দ্বন্দ্ব ছিল চলমান। ৬৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সেনাপতি গেসিয়াস ফ্লোরাস মন্দিরের কোষাগার থেকে তহবিল বাজেয়াপ্ত করলে ইহুদিরা স্থানীয় রোমীয় সৈন্যদের হত্যা করে এবং রোমের কাছ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

এর প্রায় তিন মাস পরে সেস্টিয়াস গ্যালাসের নেতৃত্বে ৩০,০০০ এর অধিক রোমীয় সৈন্য বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে আসে। ইহুদিদের পরাজিত করতে পারেনি তারা। যখন শহর থেকে ফিরে যাচ্ছিল, তখন ইহুদি বিদ্রোহীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় ও তাদের পিছু ধাওয়া করে। যিশুর অনুসারীরা এই পরিস্থিতিতে জর্দান নদীর অপর তীরে পাহাড়ে পালিয়ে যায়।[৩২]

---

৩১ লূক, ১৯ : ৪৩, ৪৪

৩২ মথি, ২৪ : ১৫, ১৬

এরপর রোমানরা বড় অভিযান পরিচালনা করে। ৭০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে রোমান সেনাপতি টাইটাস ইহুদি রাষ্ট্রে আক্রমণ করেন। সৈন্যবাহিনীকে তিনি গ্রামাঞ্চল থেকে বড় বড় গাছ কাটার নির্দেশ দেন। জেরুসালেমের চারপাশে জাঙ্গাল বা খুঁটি স্থাপন করে ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ (৪.৫ মাইল) প্রাচীর নির্মাণে গাছগুলোকে ব্যবহার করা হয়। তিন মাসের মধ্যে রোমীয় সৈন্যরা নগর ও এর মধ্যস্থিত মন্দিরে লুটপাট চালায় এবং পুড়িয়ে দেয়। তারা এমনভাবে মন্দির ধ্বংস করে যে, একটা পাথরের ওপর আরেকটা পাথর অবশিষ্ট ছিল না।[৩৩] এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেরুসালেম ও বাকি অঞ্চলে কমপক্ষে আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ ইহুদি প্রাণ হারিয়েছিল।"

শহরের সম্ভাব্য সব কিছুই তারা ধ্বংস করে। টেম্পল মাউন্ট হয়ে উঠে আবর্জনার স্তূপ। দেভিরের পশ্চিম প্রাচীর ছাড়া কেবল টেম্পল প্লাটফর্মকে ঠেকা দেওয়া বিশাল প্রাচীরগুলোই ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছিল। টেম্পল ভাঙার কাজ শেষ হলে টাইটাসের সৈন্যরা আপার সিটির রাজসিক বাড়িগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া শুরু করল, হেরডের সুন্দর প্রাসাদটি ভূপাতিত করা হলো। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করেছেন, রোমান সৈন্যরা তাদের কাজ সম্পন্ন করতে খুবই নিষ্ঠাবান আর নির্মম ছিল। বাড়িগুলো ধসিয়ে দেওয়া ও আবর্জনার নিচে চাপা পড়ার পর সেগুলো আর কখনো পরিষ্কার করা হয়নি।...জেরুসালেমে আর কখনো লোক বসতি হবে, এমনটা বিশ্বাস করতে মুসাফিরদের কষ্ট হতো।[৩৪]

তারা ফিলিস্তিন থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করে, নিষিদ্ধ করে তাদেরকে। তাদেরকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করে।

'আমরা কিতাবের মধ্যে বনি ইসরাইলকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, তোমরা জমিনে দুইবার বিশৃঙ্খলা ও ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং বড় ধরনের বাড়াবাড়ি করবে। যখন ঐ দুই ফেতনার প্রথমটার সময়কাল উপস্থিত হবে, তখন আমরা তোমাদের ওপর আমাদের এমন জঙ্গি শক্তিশালী

---

৩৩ লূক, ১৯ : ৪৩, ৪৪

৩৪ কারেন আর্মস্ট্রং : জেরুসালেম : ওয়ান সিটি থ্রি ফেইথ, ইসরাইল, হাসান শরীফ অনূদিত, অন্যধারা, বাংলাবাজার ঢাকা

লোককে বিজয়ী করব, যারা তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়বে। এটা এমন এক ওয়াদা ও ভবিষ্যদ্বাণী, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে।'[৩৫]

ফিলিস্তিনের আদিবাসিন্দা কানানিরা এসব নিপীড়ন ও নির্বাসন থেকে রক্ষা পায়। খ্রিষ্টধর্ম বিকশিত হলে তারা একে গ্রহণ করে ধীরে ধীরে।

---

৩৫ সুরা ইসরা : ৪-৫

ইসলামের নিরাপত্তায় ফিলিস্তিন

৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ারমুকের যুদ্ধ হয়। এটি ছিল এশিয়ায় রোমকদের ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনের সুরক্ষিত দুর্গগুলো মুসলমানের হাতে চলে আসে। বায়তুল মাকদিস বিজয়ে বিলম্ব করা হয়। কারণ রক্তপাত ছাড়াই বিজয়ের পন্থা তালাশ করা হচ্ছিল। শহরটি অবরোধ করা হলো এবং নগরবাসী বুঝতে পারল প্রতিরোধের চেয়ে সন্ধি উত্তম। নগরীর নেতারা চাইলেন স্বয়ং খলিফা যদি আসেন, সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হবে।

৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ওমর রা. এলেন বায়তুল মাকদিসে। শহরের খ্রিষ্টানদের প্রধান ও বাইজান্টাইন সরকারের প্রতিনিধি সোফরোনিয়াসকে তিনি নিরাপত্তাপত্র দেন। যা সেখানকার নাগরিকদের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, উপাসনালয় ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা ইত্যাদি নিশ্চিত করে।[৩৬]

চুক্তির তিন দিনের মধ্যে স্থানীয়রা রোমান সৈন্যদের শহর থেকে বের করে দেয়। রোমানরা ইহুদিদের পবিত্র পাথরকে ময়লা দিয়ে ঢেকে ফেলেছিল। জায়গাটিকে ভাগাড়ে পরিণত করেছিল। ওমর রা. পবিত্র সেই পাথর তালাশ করছিলেন। তোরাহ বিশেষজ্ঞ কাব আহবার পাথরের স্থান নির্দেশ করলেন। ওমর রা. নিজেই পাথরের জায়গা থেকে ময়লা-আবর্জনা সাফ করলেন। নিজের চাদর বিছিয়ে তিনি ময়লা সরান।[৩৭]

---

৩৬ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/৬৬৫

৩৭ প্রাগুক্ত, ৯/৬৬৬

এরপর ওমর রা. সাখরা বা প্রস্তরটিলা ও বোরাক বাঁধার স্থানটির কাছে মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি এমনভাবে বানানো হয়, যাতে ইহুদিদের উপাসনাস্থলে কোনো বিঘ্ন তৈরি না হয়।

উমাইয়া শাসনামলে খলিফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ান দামেস্কের সাথে সাথে জেরুসালেমেও খেলাফতের বাইয়াত নেন এবং শহর পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন। তিনি ৬৮৫-৮৯ খ্রিষ্টাব্দ তথা ৭৩ থেকে ৮৬ হিজরির মধ্যে মসজিদে সাখরার পুনঃনির্মাণ করেন এবং নতুন করে মসজিদে আকসা তৈরির জন্য মসজিদে আকসার দেয়ালঘেরা সকল অংশ অন্তর্ভুক্ত করেন।

৬৩৮ থেকে ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫শ' বছর মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল ফিলিস্তিন। কোনো রক্তপাত, উপাসনালয় ধ্বংস কিংবা জাতিগত নিপীড়নের কোনো ঘটনা ঘটেনি তখন। অথচ মুসলিম বিজয়ের মাত্র ত্রিশ বছর আগে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু জেরুসালেমে ভয়াবহ গণহত্যা চালান। ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে জেরুসালেম জয় করে সকল গির্জা ধ্বংস করেন এবং শহরের ৯০ হাজার খ্রিষ্টানকে হত্যা করেন।

ক্রুসেডারদের তাণ্ডব

মুসলিমদের হাত থেকে জেরুসালেম স্বাধীন করবার জন্য ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আরবান ক্রুসেড ঘোষণা করলেন। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জুলাই, মোতাবেক ২৩ শাবান ৪৯২ হিজরি, খ্রিষ্টান সেনাপতি গডফ্রে ডিবো ইউনের নেতৃত্বে ক্রুসেড বাহিনী জেরুসালেমের বাব আস সাহেরা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে এবং ৪০ দিন পর্যন্ত শহর অবরোধ করে রাখে। শেষ অবধি শহরটির পতন হয়। ক্রুসেডারগণ ভয়াবহ নিষ্ঠুরতায় মেতে ওঠে। ঝড়ের মতো শহরে প্রবেশ করে নৃশংস হত্যালীলা চালায়। তাদের হাত থেকে নারী-শিশু বা বৃদ্ধ কেউ রক্ষা পায়নি। শহরের পথেঘাটে, সর্বত্র মানুষের কাটা হাত, পা, মাথা স্তূপাকারে পড়েছিল।[৩৮]

পরের দিন সকালে তারা মসজিদে আকসায় ইবাদত ও আত্মরক্ষার জন্য অবস্থানরত মানুষের ওপর মৃত্যুতাণ্ডব চালায়। মুসল্লিদের রক্তে মসজিদের আঙিনা ভেসে যায়। সেনাপতি রেমন্ড দুপুরের সূর্য হেলার আগে এক হাঁটু রক্ত ও লাশের ওপর দিয়ে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে। এ বাস্তবতার স্বীকারোক্তি দিতে হয়েছে পশ্চিমা লেখকদেরও। 'তারা এতো ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল যে, মসজিদে ওমরে যাওয়ার পথে তাদের ঘোড়া হাঁটু পর্যন্ত রক্তে ডুবে গিয়েছিল। দেয়ালে আছড়ে আছড়ে শিশুদের হত্যা করা হয়েছে, অথবা নগর-প্রাচীর থেকে চরকির মতো ঘুরিয়ে ছুড়ে ফেলা হয়েছে।'[৩৯]

তিনদিন ব্যাপী নির্বিচার হত্যাকাণ্ডে ৯০ হাজার মুসলমানকে শহিদ করা হয়। কুব্বাতুস সাখরাকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়। মসজিদে আকসার এক অংশকে

---

৩৮ পি কে হিট্টি, দ্য হিস্ট্রি অব দ্য অ্যারাবস অবলম্বনে আরবের ইতিহাস, খন্দকার মাশহুদ উল হাছান, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা

৩৯ ব্রিটানিকা, ৯ম এডিশন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ক্রুসেডস নিবন্ধ

ঘোড়ার আস্তাবল বানানো হয়, অপর অংশকে ব্যবহার করা হয় মেজরদের বসবাসের জন্য। ১১৪৭ সালে দ্বিতীয় ক্রুসেডের নেতা হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে যান ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুই। খ্রিষ্টান দুনিয়ার নেতা পিটার তার উদ্দেশ্যে লিখলেন, তিনি আশা করেন রাজা সেই পরিমাণে মুসলিম হত্যা করতে পারবেন, মুসেজ ও যশুয়া যে পরিমাণে আমোরাইট ও কানানি হত্যা করেছিলেন।[৪০]

নিষ্ঠুর এই চরিত্র নিয়ে ৯১ বছর শাসন করে ক্রুসেডাররা। ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জেরুসালেম জয় করেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.। ক্ষমা ও মহত্ত্বের অতুলনীয় নজির তিনি প্রদর্শন করেন। একজন বেসামরিক খ্রিষ্টান বা ইহুদির রক্ত ঝরেনি সেদিন। বরং হাজার হাজার বন্দিকে নিজের পক্ষ থেকে অর্থসহায়তা দিয়ে মুক্তি দেন।

আইয়ুবি প্রথম শুক্রবার মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে পারেননি। কেননা, তাতে খ্রিষ্টানদের টয়লেট, ঘর ও ময়লা-আবর্জনা ছিল। তিনি নিজ হাতে সেগুলো ঝাড়ু দেন ও পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করেন। ৫৮৩ হিজরির ৪ শাবান, ২য় শুক্রবার, তিনি তাতে জুমার নামাজ আদায় করেন। ক্রুসেডের আগে মুসলিম শাসনামলে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনে ইহুদিসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষে পৌঁছে। ক্রুসেডাররা অধিকাংশকেই হত্যা করে, অনেককে নির্বাসনে পাঠায়।

সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বিজয়ের সময় ফিলিস্তিনে ইহুদি পরিবার ছিল মাত্র এক হাজার। খুব মানবেতর জীবনযাপন করছিল তারা। আইয়ুবি তাদের নিরাপত্তা বিধান করেন।[৪১]

এর পরে বা আগে মুসলিম শাসন ইহুদিদের প্রশ্নে ন্যায়ভিত্তিক আচরণ করেছে। তাদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং যে ইহুদিরা মুসলিম শাসিত অঞ্চলে ছিলেন, তারা নিরাপত্তা, সম্মান ও অগ্রগতিকে আলিঙ্গন করতে পারছিলেন।

১৫ শতক থেকে ২০ শতক অবধি উসমানি শাসনামলে ফিলিস্তিনে কোনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান নিপীড়নের ঘটনা দেখেনি। কিন্তু ইউরোপে তখন ইহুদিদের ওপর নির্মমতা চূড়ান্ত আকার নিয়েছে।

---

৪০ বেঞ্জামিন কেডার, ক্রুসেড এন্ড মিশন: ইউরোপিয়ান এপ্রোচেস টু দ্য মুসলিম, প্রিন্সটন ১৯৮৪, পৃ. ১০১

৪১ Understanding Jewish History by Scharfstein, Sol, Gelabert, Dorcas (June 1, 1996) , p. 145

ইউরোপের কালো দিনগুলো

ইউরোপে নির্বাসিত ইহুদিদের বহন করতে হয় খ্রিষ্ট-বিরোধিতার দায়। বাইজেন্টাইন রাজারাও তাদের প্রতি সদয় ছিলেন না। ইহুদিরা ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে। রোমানরা খ্রিষ্টান হলো। যিশুখ্রিষ্টের অনুসারীরা ইহুদিদেরকে খ্রিষ্টের শত্রু হিসেবে দেখেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। ইহুদিরা ছোট্ট শিশুদের হত্যা করে তাদের রক্ত পাসওভার ব্রেডের সঙ্গে মেশায়। উদ্দেশ্য- খ্রিষ্টের শেষ ভোজসভাকে অসম্মানিত করা। যাতে খ্রিষ্টান বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করার আন্তর্জাতিক চক্রান্তে অংশ নেওয়া যায়।[৪২]

সরকারিভাবে বর্ণবাদী নীতি গ্রহণ করা হয়, যেন ইহুদিদের সাথে কেউ কোনো রকম যোগাযোগ রাখতে না পারে। ১১৭৯ এবং ১২১৫ সালে ল্যাটারান কাউন্সিলে গৃহীত স্পেশাল চার্চ লেজিসলেশন মুসলিমদের পাশাপাশি ইহুদিদেরকে সাধারণ শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে। তাদের বাড়িঘর থেকে সেবা গ্রহণ করা যাবে না। তাদের সাথে আহার করা অপরাধ, তাদের সাথে লেনদেন করা যাবে না, তাদের শিশুদের প্রতি মমতা পোষণ করা যাবে না। 'এর শাস্তি হিসেবে গির্জার সদস্যপদ বাতিল এবং পরবর্তীতে সম্পত্তি ক্রোকের মতো বিধান রাখা হয়েছিল।'[৪৩]

ইউরোপের দেশে দেশে এরপর ইহুদিদের জীবন ছিল বিচিত্র দুর্গতিতে জর্জরিত। ১২২৭ সালে পোপ নবম গ্রেগরি আরো কিছু ডিক্রি জারি করেন :

---

৪২ কারেন আর্মস্ট্রং, মুহাম্মদ (স.) মহানবীর জীবনী, পৃ. ৩১, অনুবাদ শওকত হোসেন, সন্দেশ, ২০০৫

৪৩ প্রাগুক্ত. পৃ. ৩১

মুসলিম ও ইহুদিদের আলাদা পোশাক পরা বাধ্যতামূলক, খ্রিষ্টানদের উৎসবের সময় তারা রাস্তায় বেরোতে পারবে না, কোনো সরকারি চাকরি তারা করতে পারবে না।[৪৪]

১৪৯২ সালে মুসলিম স্পেনের পতন হয়। সেখানে শুরু হয় ইনকুইজিশন। মুসলিমদের মতো লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে হয় ধর্ম বদলাতে হয়েছে, নয় মরতে হয়েছে বা ছাড়তে হয়েছে দেশ।

'অনেক ইহুদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে স্পেনে থেকে যায়, আবার অনেকেই পালিয়ে যায় মুসলিম অটোমান সাম্রাজ্যে। সেখানে তাদের স্বাগত জানানো হয়।'[৪৫]

তখন ৭০, ০০০ ইহুদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ১৫০,০০০ ইহুদি চলে যায় নির্বাসনে। খ্রিষ্টানদের হাতে ইহুদিদের এই বিনাশ ৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুসালেমের ধ্বংসলীলার পর সবচেয়ে বড় বিনাশযজ্ঞ। কিন্তু ইহুদি নিধন ও বিতাড়ন তখন শুধু স্পেনেই হয়নি। ইংল্যান্ডে ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে, ফ্রান্সে ১৩৯১ সালে, অস্ট্রিয়ায় ১৩৯১ সালে ইহুদি নিধন ও নির্বাসন ঘটে।

ভিয়েনা ও লিনয থেকে ১৪২১, কোলন থেকে ১৪২৪, অসবার্গ থেকে ১৪৪৯, বাভারিয়া থেকে ১৪৪২, মোরাভিয়া থেকে ১৪৫৪, রেগিয়া থেকে ১৪৮৫, ভিসেনযা থেকে ১৪৮৬, পারমা থেকে ১৪৮৮, মিলান ও লুক্কা থেকে ১৪৮৯ এবং তাসকানি থেকে ১৪৯৪ সালে ইহুদি বিতাড়নের ঘটনা ঘটে। নির্বাসনকে ইহুদিরা তখন অলঙ্ঘনীয় অসুখ মনে করত। ধীরে ধীরে তারা পোলান্ডে পা রাখে।[৪৬]

নিকৃষ্ট চরিত্র, বর্ণবাদ, খ্রিষ্টবিরোধিতা, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা এমনকি প্লেগ ছড়ানোর অজুহাতসহ নানা কারণে ইউরোপে হত্যালীলাই ছিল ইহুদিদের নিয়তি। কিন্তু ইহুদিরা মুসলিম স্পেনে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক রেনেসাঁ

---

৪৪ কারেন আর্মস্ট্রং, মুহাম্মদ (স.) মহানবীর জীবনী, পৃ. ৩১. অনুবাদ শওকত হোসেন, সন্দেশ, ২০০৫

৪৫ পল জনসন, এ হিস্ট্রি অব দ্য জুইস, লন্ডন, ১৯৮৭; ইরমিয়াহু ইযোভেল, স্পিনোজা এন্ড আদার হেরেটিক্স, ১: দ্য মরানো অব রিজন, প্রিন্সটন

৪৬ প্রাগুক্ত. ২৩০-৩১

উপভোগ করেছে। কিন্তু ইউরোপের বাকি অংশে হত্যালীলা তাদের নিয়তিতে পরিণত হয়েছিল।'[৪৭]

১২১০ সালে ইউরোপের ঘৃণা ও মৃত্যু থেকে পালিয়ে তিনশত রাব্বি ফিলিস্তিনে আসেন। মুসলিমরা তাদের আতিথ্য করলেও ১২২৯ সালের ক্রুসেড তাদের বংশকে ধ্বংস করে দেয়।

স্পেনে মুসলিম পতনের পরে উসমানিদের শাসিত বলকানসহ অন্যান্য অঞ্চলে ইহুদিরা আশ্রিত হয়। সেখানকার সেফারদিকরা ধর্মগ্রন্থে তালাশ করতে থাকে নিজেদের উত্তরণ। কিন্তু ধর্ম তো দুঃসময়ে তাদের সাহায্য করেনি। ফলে ধর্মের যা কিছু তাদের রাজনৈতিক সংকটের সুরাহা করবে, তাকেই নিজেদের মতো করে কাজে লাগায়। তারা ইহুদিদের প্রতিশ্রুত দেশ, একজন মসিহের আগমন ইত্যাদি মিথকে নিজেদের অনুকূলে সাজায়। সেফারদিকদের একটা দল বলকান অঞ্চল ফিলিস্তিনে পাড়ি জমায়। এখানে গালিলির সেফেদে বসতি গড়ে। কারণ মসিহের আবির্ভাবের সময় আসছে এবং তিনি গালিলিতেই নিজেকে প্রকাশ করবেন। সবার আগে তাকে স্বাগত জানাতে সেখানে হাজির থাকতে চেয়েছিল ইউরোপের নির্বাসিতরা।[৪৮]

ক্রমাগতভাবে নিজেদের অস্তিত্বকে হুমকি দিতে থাকা পৃথিবীতে ইহুদিদের জন্য উসমানি ভূমি ছিল একখণ্ড বিশ্রাম। ইসাক লুনিয়াহ (১৫৩৪-৭৩) ও পরবর্তী কাব্বালাহ্ আন্দোলন তাদের শেখাল, আর কোথাও কোনো বিশ্রামের সুযোগ নেই। ইহুদিদের কোনো মাতৃভূমি নেই। ফলে নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্য, জাতিগত ঐক্য এবং জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলই হবে তাদের অভিভাবক। এর ভেতর থেকেই বের হবে ভবিষ্যতের রাষ্ট্র। কাব্বালিস্টরা

---

৪৭ পল জনসন, এ হিস্ট্রি অব দ্য জুইস, লন্ডন, ১৯৮৭; ইরমিয়াহু ইযোভেল, স্পিনোজা এন্ড আদার হেরেটিক্স, ১: দ্য মরানো অব রিজন, প্রিন্সটন, পৃ. ২২৪-২৫

৪৮ গার্শোম শোলেম, দ্য মিস্ট্রিক্যাল মেসায়াহ, লন্ডন ও প্রিন্সটন, ১৯৭৩, পৃ. ১১৮-১১৯

এজন্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ইহুদিদের দৃষ্টিকে জেরুসালেমের প্রতি ধাবিত করতে চাইল।[৪৯]

কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রগঠন তখন তো অলীক কল্পনা। কিন্তু কাব্বালাদের বিচারে যখন তা হবে, তখন তা বাস্তব। কিন্তু যখন তা হচ্ছে না, তখন তা আশা, পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা। এই আশা, পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা আমাদের বেঁচে থাকাকে অর্থ, ঐক্য ও লক্ষ্য প্রদান করবে। ইহুদিদের জ্ঞানগত রেনেসাঁ ঘটে গিয়েছিল মুসলিম স্পেনে। এবার তারা সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে দুনিয়াকে বদলে দেবার কর্মযজ্ঞে মগ্ন হলো। যে খ্রিষ্টীয় বিশ্ব তাদের নিপীড়ন করছে, তাদের বদলে দেবার সর্বপ্লাবী কর্মপ্রয়াস শুরু হলো। ফরাসি বিপ্লব ইউরোপে খ্রিষ্টানদের সাথে ইহুদিদের সমান্তরাল করে দিলো। নেপোলিয়ান তাদের সহায়তায় রাখলেন বিশেষ ভূমিকা। আধুনিকতা নতুন দৃষ্টিকোণের কেন্দ্রে নিয়ে এলো তাদের। রিফর্মেশন এবং প্রটেস্ট্যান্ট ও এংলিকান বিপ্লব খ্রিষ্টহত্যা ও বিরোধিতার দায় থেকে তাদের নিষ্কৃতি দিলো। তাদের প্রতিশ্রুত রাষ্ট্রের লক্ষ্যকে খ্রিষ্টানদের বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করল। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস ও চেতনায় এমন সব সংকট তৈরি করল, যার ফলে সংঘাত ছিল অবধারিত। ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ সাল অবধি ত্রিশ বছরের যুদ্ধে চার থেকে আট মিলিয়ন খ্রিষ্টান সরাসরি যুদ্ধে এবং রোগ ও দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল। ইহুদিদের শত্রু রোমান ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স চার্চ প্রভাব হারায়। খ্রিষ্টানরা ভাগ হয় অগণিত দলে-উপদলে। বাদ যায় না প্রটেস্ট্যান্ট-এংলিকানরাও। তাদের মধ্যে জন্ম নেয় মোরাভিয়া, লুথারিয়া, ক্যালভিনিয়া এবং প্রেসবাইটেরিয়ান ব্যাপটিস্ট, কংগ্রেগেশানালিস্ট, মেথডিস্ট, ইভানজেলিকান, মডার্নিস্ট ও এংলো ক্যাথলিক ইত্যাদি শাখা। ইহুদিরা সবার ওপরেই বিছিয়ে দেয় প্রভাবজাল। ১৮ এবং ১৯ শতকে বার্লিনভিত্তিক Haskala আন্দোলন বুদ্ধিভিত্তিক পরিবর্তনের নতুন মাত্রা বিস্তার করে। অ-ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে একীকরণ, ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ে শিক্ষার উন্নতি, হিব্রু এবং ইহুদি ইতিহাসের শিক্ষাদান ছিল এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা এবং

---

৪৯ Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, Macmillan Publishing, New York, 1987 Vol-12, Pages: 117-24

সংস্কৃতির সাথে ইহুদি চিন্তাধারার মেলবন্ধন তৈরিতে তা বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ঔপনিবেশিকতা জেরুসালেমের পথে তাদের প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে সামনের পথকে সুগম করল। তারপরও ইহুদিবিদ্বেষ ইউরোপীয় গণজীবনে মোটেও কম ছিল না। আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপ-আমেরিকার বাসিন্দাদের অনেকের বাড়িতেই একটি সাইন বোর্ড ঝুলানো থাকত। যাতে লেখা থাকত 'Dogs and Jews are not allowed!' কুকুর ও ইহুদির প্রবেশ নিষেধ।[৫০]

হিটলার ও নাৎসিদের ঘৃণায় ইহুদিরক্তে কম রঞ্জিত হয়নি বিশ্বযুদ্ধকালীন ইউরোপ। ইহুদিদের যে চিত্র অঙ্কিত ছিল পশ্চিমা সাহিত্যে, তাকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা জরুরি ছিল। ইহুদি কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। উনিশ শতকে দেখা গেল পশ্চিমা দুনিয়ার চালকশ্রেণির মন ও মস্তিষ্ক ইহুদিদের দখলে চলে গেছে প্রায়। চরম দুর্গতি থেকে উত্তরণের পথে এ অগ্রগতি ছিল বিস্ময়কর।

---

৫০ MICAH THAU: No Dogs and Jews Allowed; Jerusalem Post, MAY 11, 2019

প্রতিশ্রুত ভূমি : ন্যায্যতা-অন্যায্যতা

কাব্বালা আন্দোলন ইহুদিদের বিলুপ্তপ্রায় বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবন ঘটাল। ইহুদিরা হলেন Chosen People বা ঈশ্বরের বাছাইকৃত জাতি। আব্রাহামের সাথে খোদা তায়ালা তার বংশধরদের জন্য যে ভূমির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ইহুদিরা সেই ভূমির ন্যায্য মালিক। বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায় আছে সেই প্রতিশ্রুত ভূমির কথা। স্বয়ং বাইবেল জানাচ্ছে, প্রতিশ্রুত ভূমি দানের শর্ত হলো ইবরাহিমের (আ.) একত্বের আদর্শ মানা, ন্যায়নিষ্ঠ কর্মপন্থা ও জীবনাচারে বিশুদ্ধতা। 'আমি আব্রাহামের সাথে এক বিশেষ চুক্তি করেছি। প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপনের জন্যে যাতে আব্রাহামের সন্তানসন্ততি ও উত্তরপুরুষগণ আব্রাহামের আজ্ঞা পালন করে তাই এই ব্যবস্থা করেছি। এটা করেছি যাতে তারা ন্যায়পরায়ণ ও সৎ জীবনযাপন করে। তাহলে আমি প্রভু, প্রতিশ্রুত জিনিসগুলো দিতে পারব। ইহুদিরা দাসত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত ভূমিকে স্বর্গ হিসাবে কল্পনা করত।'[৫১]

বাস্তবে সেখানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা দেখছিল না তারা। ফলে সেখানে সাধারণত মৃত্যুর মাধ্যমে পৌঁছানোর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বাস্তবে কীভাবে তাকে প্রতিফলিত করা যায়, সেই চেষ্টাও শুরু হলো। তার ফলাফল হিসেবে জন্ম নিলো জায়নবাদ। কিন্তু আসলেই কি ইহুদিরা এই প্রতিশ্রুত ভূমির হকদার? এটা কি বর্ণবাদী প্রতিশ্রুতি? এই প্রতিশ্রুতি কি নিছক বংশ বা রক্তের ভিত্তিতে?

---

৫১ 53 For example: Beaulieu Herder, Nicole; Herder, Ronald. Best-loved Negro Spirituals: Complete Lyrics to 178 Songs of Faith. Dover Books on Music. Mineola, New York: Courier Corporation. পৃষ্ঠা ১, ১০, ৩৩, ৫৮

না, তা নয়। ভূমির অধিকার অনেকগুলো শর্তের ওপর নির্ভরশীল। এই শর্ত বাইবেলে ঘোষিত হয়েছে বহুবার। ইসরাইল জাতিকে অবশ্যই ঈশ্বরের একত্ব ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মানতে হবে, বিধিব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে। বিদ্রোহ ও অনাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না করলে বঞ্চনা হবে তাদের ভাগ্যলিপি, তাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তারা কেবল ইসরাইলি বংশের বলেই ঈশ্বরের বিশেষ লোক হতে পারবে না। ঈশ্বরের বিশেষ লোক হতে হলে কী করতে হবে, জানাচ্ছে বাইবেল।

'এখন আমি তোমাদের বলছি, আমার হুকুমগুলো মেনে চলো। আমার সাথে করা প্রতিশ্রুতি পালন করো। তাহলেই কেবল তোমরা হবে আমার বিশেষ লোক। সারা জগৎ তো আমারই। আর তোমাদেরকে আমি করেছি নিজের আপনজন।'[৫২]

এই শর্তের ভিত্তিতে যারা আপন, তাদেরকে ঈশ্বর শোনাচ্ছেন ভূমির প্রতিশ্রুতি। মুসেজকে লক্ষ্য করে প্রভুর বার্তা– তোমরা পুণ্যমানুষদের হবে বিশেষ এক রাষ্ট্র। আমি যা বললাম, তা তুমি ইসরাইলিদের অবশ্যই জানাবে।[৫৩]

কিন্তু শেষ অবধি ইসরাইলিরা সাধারণভাবে সদাপ্রভুকে ত্যাগ করল। মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত হলো। সদা প্রভুর আনুগত্য পূর্বপুরুষের স্মৃতির বিষয়ে পরিণত হলো। পৌত্তলিকতার জন্য দেবতাসমূহ স্থির করে নিলো। তোরাহ জানাচ্ছে– প্রভু ইসরাইলবাসীদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন। এদের পূর্বপুরুষরা প্রভুর সেবা করত। কিন্তু এখন তারা প্রভুকে ত্যাগ করল। তাদের চারিধারে বসবাসকারী লোকরা মূর্তির পূজা করতে শুরু করল। এই কারণে প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন।

ইসরাইলের লোকরা প্রভুকে ত্যাগ করে বা'ল ও অষ্টারোতকে পূজা করতে লাগল।[৫৪]

শুধু তাই নয়। তাদের পাপ সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তোরাহের ভাষ্য–

---

৫২ লেবীয় পুস্তক (Leviticus) ২৬ : ১৮, ২১, ২৩-২৪, ২৭-২৮

৫৩ দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronom) ২৮ নং অধ্যায়

৫৪ বিচারকগণ, ২ : ১২-১৩

'তারা ব্যভিচারমূলক পাপ করেছে। তারা দণ্ডযোগ্য অপরাধে অপরাধী। তারা একজন বেশ্যার মতো আচরণ করেছে। তাদের নোংরা মূর্তিগুলোর সঙ্গে থাকবার জন্য আমাকে ত্যাগ করেছে। তাদের কাছে আমার যে সন্তানেরা ছিল, তাদের তারা জোর করে আগুনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করেছে; যাতে তারা তাদের নোংরা মূর্তিগুলোকে খাদ্য যোগাতে পারে।

তারা আমার বিশ্রামের বিশেষ দিন ও পবিত্র স্থানকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। তারা তাদের মূর্তিগুলোর জন্য তাদের সন্তানদের হত্যা করেছে এবং সেই একইদিনে আমার সে জায়গাটাকে অশুচি করেছে। দেখ, তারা এসমস্তই আমার মন্দিরের মধ্যে করেছে![৫৫]

এসবের পরিণতি হিসেবে সদাপ্রভু তাদের জন্য যা স্থির করলেন, তা হলো : (ক) নির্বাসন, (খ) শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকা, (গ) সকল অধিকার কেড়ে নেওয়া, (ঘ) ইসরাইলিদের পরাজিত জাতিতে পরিণত করা, (ঙ) চরম দুর্দশা ও ভয়াবহ লাঞ্ছনা, (চ) অব্যাহত পরাজয়, (ছ) সদাপ্রভুর ক্রোধ।

তোরাহের বয়ান– প্রভু ইসরাইলবাসীদের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলেন তাই তিনি ইসরাইলবাসীদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হতে দিলেন। শত্রুরা ইসরাইলবাসীদের আক্রমণ করল এবং তাদের অধিকারের সব কিছু নিয়ে নিলো। প্রভু তাদের ইসরাইলবাসীদের পরাস্ত করতে দিলেন যারা নিজেদের রক্ষা করতে অসমর্থ ছিল।

যখনই ইসরাইলিরা যুদ্ধ করত, তারা হেরে যেত। কারণ প্রভু তাদের দিকে ছিলেন না। তিনি তো তাদের নিষেধ করে বলেছিলেন যে তাদের ঘিরে যেসব মানুষ রয়েছে তাদের দেবতাদের পূজা করলে তারা হেরে যাবে। এর ফলে ইসরাইলিদের চরম দুর্দশা হলো।[৫৬]

সদাপ্রভুর ক্রোধ, ধিক্কার ও অভিশাপ তাদের প্রতি তো বটেই, তাদের বাসস্থানের প্রতিও। সদাপ্রভু বলেন, 'জেরুসালেম! তুমি আমায় ভুলে গেছ। তুমি আমায় দূর করে একাকী রেখে গেছ। আমাকে পরিত্যাগ করার জন্য ও

---

৫৫ এজেকিয়েল, ২৩ : ৩৭-৩৯

৫৬ বিচারকগণ, ২ : ১৪-১৫

বেশ্যার মতো জীবনযাপন করার জন্য তোমায় তাই কষ্ট ভোগ করতে হবে। তোমার দেখা দুষ্টু স্বপ্নের জন্যও তোমায় কষ্টভোগ করতে হবে।'[৫৭]

যিশুখ্রিষ্টের মুখ দিয়ে অবশেষে উচ্চারিত হলো– 'জেরুসালেম, হায় জেরুসালেম! তুমি পয়গম্বরদের হত্যা করেছ; আর ঈশ্বর তোমার কাছে যাদের পাঠিয়েছেন তুমি তাদের পাথর মেরেছ! মুরগি যেমন তার বাচ্চাদের নিজের ডানার নিচে জড়ো করে, তেমনি আমি কতবার তোমার লোকদের আমার কাছে জড়ো করতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি রাজি হওনি।'[৫৮]

... তোরাহের এই যে ভাষ্য, তা দেখায় প্রতিশ্রুত ভূমির অধিকার কীভাবে হারিয়েছে ইহুদিরা। যে প্রভু তাদেরকে ভূমির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনিই কীভাবে তা থেকে উচ্ছেদ করেছেন তাদেরকে।

---

৫৭ এজেকিয়েল, ২৩ : ৩৫

৫৮ লূক, ১৩ : ৩৪

মানুষহীন ভূমি ও ভূমিহীন মানুষ

জায়নবাদ দাবি করে ফিলিস্তিন ছিল মানুষহীন ভূমি, আর ইহুদিরা ছিল ভূমিহীন মানুষ। ফলে তাদের জন্য এই ভূমিটাই ছিল ন্যায্য। কিন্তু ফিলিস্তিন ইতিহাসের কোনো কালেই মানুষহীন ভূমি ছিল না। ইসলাম ও ইহুদি-খ্রিষ্টান জগতের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ শহর যেখানে, সেই ভূমি কীভাবে মানুষহীন হবে?

আল কুরআনে ফিলিস্তিনি ভূমিকে বলা হয়েছে আরদুল মুবারাকাহ। বরকতময় ভূমি।[৫৯] সেই ভূমিতে কত নবী-রাসুল, কত সাহাবি-তাবেয়ি আর কত মহামনীষী শুয়ে আছেন। ফিলিস্তিনের প্রায় প্রতিটি জনপদের সাথে মুসলিম সভ্যতার গভীর আবেগ ও ঐতিহ্যপূর্ণ বিষয় জড়িত। খ্রিষ্টান বা ইহুদি ঐতিহ্যেও তা রয়েছে। উসমানি আমলে তা মানুষহীন ভূমি হয়ে ওঠার কোনো কারণ ঘটেনি। বরং জনসংখ্যা, শহর-নগর, ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি কারণে উসমানিসহ গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যে ফিলিস্তিন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও উন্নত অঞ্চল। এ অঞ্চলে বছরজুড়ে বৃষ্টি হয়। সারা বছর তাপমাত্রা থাকে স্বাভাবিক। শীত কিংবা গ্রীষ্ম সবসময়ই তাপমাত্রা থাকে ১৯-২৭ ডিগ্রির মধ্যে। ফিলিস্তিন হলো এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মিলনস্থল। বায়তুল মাকদিস তো বটেই, এর নিকটবর্তী ভূমিও মুসলিমদের অত্যন্ত প্রিয় ও মূল্যবান।[৬০]

---

৫৯ সুরা ইসরা, আয়াত : ১

৬০ মুসতাদরাক হাকিম : ৮৫৫৩; তালখিসুল মুসতাদরাক : ৪/৫০৯

ফিলিস্তিনের গুরুত্বের কেন্দ্রে ছিল মুসলমানদের প্রথম কিবলা, মসজিদে আকসা। নবীজির ইসরার প্রান্ত, আল্লাহর উদ্দেশ্যে মেরাজে ঊর্ধ্বারোহণের সূচনাস্থল, মহান ফজিলতময় মসজিদ, অগণিত পুণ্যস্মৃতির ভূমি এই ফিলিস্তিন। এর সাথে জড়িত কেয়ামতপূর্ব পৃথিবীর বহু বিষয়, এমনকি মৃত্যুপরবর্তী জীবনের বিশ্বাসের সাথেও রয়েছে এর প্রাসঙ্গিকতা। সারা দুনিয়া থেকে মুসলিমরা আকসায় সফর করতেন। এর রয়েছে বিশেষ মহিমা।[৬১]

এ প্রসঙ্গে রচিত হয় বহু গ্রন্থ। হাফিজ ইবনে আসাকিরের আল জামিউল মুসতাকসা ফি ফাজায়িলি মাসজিদিল আকসা, শায়খ বুরহান উদ্দিন জুরারির বায়িসুন নুফুস ইলা জিয়ারাতিল কুদসিল মাহরুস, শিহাব উদ্দিন আল মাকদিসির মুসিরুল গারাম ইলা জিয়ারাতিল কুদসি ওয়াশ শাম, শামসুদ্দিন সুয়ুতি আল-মাকদিসির ইতহাফুল আখসা বি ফাজায়িলি মাসজিদিল আকসাসহ বহু গ্রন্থ দেখায় আরদে মুবারাকাহ (ফিলিস্তিন) ও বায়তুল মাকদিসের মহিমা। এর প্রতি মুসলিমদের ভক্তি, আবেগ, এর সমৃদ্ধ চিত্র। ইয়াকুত হামাবি, ইবনে বতুতা কিংবা নাসির খসরুর সফরনামা সমৃদ্ধ ফিলিস্তিনকেই প্রকাশ করে। উসমানি আমলে সিরিয়ার বিখ্যাত আইনবিদ ও বিদ্যাপুরুষ ছিলেন শায়খ আব্দুল গনি নাবুলুসি। আল-হাদরাতুল আনিসা ফির রিহলাতিল কুদসিয়া রচিত হয় ১০১১ হিজরি মোতাবেক ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে। এতে ফিলিস্তিনের সমৃদ্ধ নগর-শহর, বিদ্যাচর্চা, চিন্তা ও শিল্পচর্চা, আধ্যাত্মিক সাধনা, মানুষের জীবনের প্রাণপূর্ণ চিত্র, মুখর ও সমৃদ্ধ জনপদসমূহের চিত্রপট সুস্পষ্ট। বস্তুত সমকালীন উসমানি নথিপত্র, ভ্রমণ কাহিনি, প্রত্যক্ষ বিবরণী এবং ঐতিহ্যগত ভাষ্যসমূহ ফিলিস্তিনকে সমৃদ্ধ, উন্নত জীবনমানে বিকশিত একটি অঞ্চল হিসেবে উপস্থাপন করে।

মোহাম্মদ কুরদ আলীর খুতাতুশ শামের ষষ্ঠ খণ্ড তখনকার চিত্ররূপ তুলে ধরেছে, ডক্টর আবদুল ফাত্তাহ ওমর উয়াইসির মাকানাতু ওয়া তারিখু বাইতুল মাকদিসি ফিল ইসলাম গ্রন্থও এ বিষয়ে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ হাজির করে।

---

৬১ সহিহ বুখারি : ১১৮৯; সহিহ মুসলিম : ১৩৯৭

যা মানুষহীন ভূমিতত্ত্বকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে। এই ভূমি সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা,

وَ نَجَّيْنٰهُ وَ لُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

'আর আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই ভূখণ্ডে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।'[৬২]

মুসলমানরা তাই কল্যাণের এই ভূমিতে বসবাস ও তাকে গুরুত্বদানের প্রশ্নে অবহেলা করেননি কোনো কালেই।

---

৬২ সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৭১

ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইহুদিদের ঐতিহাসিক দাবি

জায়নবাদের আরেকটা তত্ত্ব হলো, ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইহুদিদের ঐতিহাসিক দাবি রয়েছে। কিন্তু এ দাবির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

ফিলিস্তিনের যে ভূমিপুত্ররা ইহুদিদের জন্মের হাজার বছর আগ থেকে এই ভূমি আবাদ করছেন, সেই কানানিদের বংশধররাই এখনকার ফিলিস্তিনি। তাদের কেউ কেউ খ্রিষ্টান হয়েছেন। বাকিরা হয়েছেন মুসলমান। ইহুদিরা এই ভূমিতে এসেছিল দখলকারী হিসেবে। মাত্র চারশত বছর টিকেছিল এখানে। তারপর উচ্ছেদ হয়েছে দুই হাজার বছর আগে। ইহুদিরা উচ্ছেদ হলেও থেকে গেছে ভূমিপুত্র ফিলিস্তিনিরা। এছাড়া ইহুদিরা দখল করেছিল ফিলিস্তিনের বিশেষ কিছু এলাকা। বাকি ফিলিস্তিনে তাদের আমলেও বাস করেছে কানানি জেবুসি আরবরা। তাদেরকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়নি।[৬৩] তাদের বসবাস এই ভূমিতে নিরবচ্ছিন্ন। সেখানে বহু জাতি এসেছে, দখল জারি করেছে, তারপর বিতাড়িত হয়েছে বাতাসে উড়ে যাওয়া ঝরা পাতার মতো।

বিতাড়িত হবার পরে প্রায় উনিশ শত বছর ধরে ফিলিস্তিনের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না ইউরোপীয় ইহুদিদের। ফিলিস্তিনে বিদ্যমান ছিল মুষ্টিমেয় কিছু ইহুদি। তারা তাদের ভূমির ন্যায্য বাসিন্দা সেখানকার মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মতোই। তারা হলেন মিজরাহি ইহুদি। আর ইউরোপ থেকে আসছিল আশকেনাজি ইহুদিরা। এরা ইহুদিদের মধ্যে নিজেদের সবচেয়ে

---

৬৩ বিচারকগণ, ১ : ২১

উচ্চবর্ণের বলে দাবি করে। মানবজাতির অন্য যেকোনো নৃগোষ্ঠীর তুলনায় তারা নিজেদের মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে।[৬৪]

এমনতর বর্ণবাদী চর্চা তাদের মধ্যে নানামুখী। কিন্তু সেটা এখানে মুখ্য নয়। মোদ্দাপ্রশ্ন হলো, ইউরোপ-আমেরিকা, রাশিয়া, ল্যাতিন আমেরিকা ইত্যাদি অঞ্চলের ইহুদিরা কীসের ভিত্তিতে ফিলিস্তিনে নিজেদের অধিকার দাবি করতে পারে?

একদা কিছু ইহুদি সেই ভূমি দখল করে শাসন করেছিল, সেই ভিত্তিতে ফিলিস্তিনের ভূমি যদি প্রায় দুই হাজার বছর পরে ইহুদিদের হয়, তাহলে স্পেন, পর্তুগাল ও সিসিলি কেন আরবদের হবে না? গ্রিস, হাঙ্গেরি ও সার্বিয়া কেন তুরস্কের হবে না?

বস্তুত পশ্চিমা ইহুদিদের সিংহভাগই না বংশে বনি ইসরাইল, না রক্তসম্পর্কে। তারা বরং আর্য জনগোষ্ঠীজাত। উত্তর ককেশাসে বসবাস করত এদের পূর্বপুরুষ। একদা তারা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তারা যদি নিজেদের ফেলে আসা প্রাচীন ভূমিতে অধিকার দাবি করেন, সে দাবি নিয়ে ককেশাসে হাজির হোন, রাশিয়াকে ভূমি ছেড়ে দিতে বলুন। কিংবা যে ইউরোপে তারা ছিলেন হাজার বছর, যে ইউরোপ তাদেরকে হত্যা ও নির্বাসন দ্বারা পিষ্ট করেছে যুগ যুগ ধরে, সেই ইউরোপে তারা ভূমি দাবি করুন। বস্তুত ইউরোপে, আর্জেন্টিনায়, এমনকি আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে ইহুদিদের রাষ্ট্র গড়ে দেবার প্রকল্প ছিল। কিন্তু পশ্চিমারা কোনোভাবেই চায়নি ইহুদি সমস্যা তাদের ভূমিতে থাকুক। আর জায়নবাদ প্রবলভাবে চাইছিল ফিলিস্তিন! J.N Darloy প্রতিষ্ঠিত Plymouth Brethren আন্দোলন ব্রিটেনের মেধাবী তরুণদের ইহুদিরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষায় জাগিয়ে তোলে। ১৮৪০ এর দশকে লর্ডসভার প্রভাবশালী সদস্য সাফটেসবারি এবং পালামারস্টন ফিলিস্তিনে ইহুদি কলোনি তৈরির প্রকল্প পেশ করেন। কারণ এটাই ইহুদি-সমস্যার প্রকৃত সমাধান।

৬৪ "On the high intelligence and cognitive achievements of Jews in Britain". Intelligence. 34 (6): 541-547

জায়নবাদ

জায়োনিজম শব্দটি এসেছে হিব্রু জায়ন (zion) শব্দ থেকে। জায়ন হলো মূলত জেরুসালেমের মাউন্ট জায়ন বা জায়ন'স হিল। ১৮৯৫ সালে অস্ট্রীয় লেখক নাথান বারনবুম 'জায়নইজম' বা জায়নবাদ শব্দটি প্রবর্তন করেন।

জায়নবাদ হলো ইহুদি শ্রেষ্ঠত্ববাদের এক বহুমুখী প্রত্যয়। যা মূলত জায়ন পাহাড়কে ঘিরে কেনানের চারদিকের প্রতিশ্রুত ভূমি নিয়ে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও তার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের চিন্তা ও কর্মধারা। প্রকৃত অর্থে জায়নবাদ ইহুদি চরমপন্থিদের একটি আন্দোলন। সে ইহুদিরাষ্ট্র কিংবা প্রতিশ্রুত ভূমি দখলই শুধু চায় না, বরং বিশ্বব্যাপী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই তার অভিপ্রায়। সে কেবল ইহুদিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। লক্ষ্যপূরণে সে খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিক হিন্দুদের বিশেষ অংশকে সাথে নিতে চায়। এমনকি সে মুসলিমদের মধ্যেও নিজের বিস্তার ঘটায়। আধুনিক জায়নবাদের জনক হলেন হাঙ্গেরিয়ান চিন্তক থিওডর হার্জল। ১৮৯৭ সালে ওয়ার্ল্ড জায়োনিস্ট অর্গানাইজেশন নামে একটি সংস্থা গঠন করেন তিনি ও তার সহযোগী ম্যাক্স সিমন নরডাউ। উসমানি সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের কাছে ফিলিস্তিনে উপনিবেশ তৈরির ভূমি চান হার্জেল। বিনিময়ে দিতে চান বিপুল অর্থ। খলিফা এতে সম্মত হননি।

১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে ইহুদিদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইহুদিদের রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এজন্য ফিলিস্তিনে ভূমিগ্রহণ, ইহুদিদের কলকারখানা তৈরি, কৃষি বসতি স্থাপন, বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ইহুদিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ছড়ানো ও ফিলিস্তিনমুখী করা এবং বিভিন্ন দেশের সরকারকে জায়নবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার পরিকল্পনা প্রণীত হয়।[৬৫]

---

৬৫ দ্র. আস-সাহয়ুনিয়্যা বি-ইজায, পৃ. ১৬-১৭; এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা, জায়নিজম

জায়নবাদ বিরোধী ইহুদি

তোরাহ্ জানায়, মসিহের আগমনের পরে গঠিত হবে ইহুদি রাষ্ট্র।

প্রেসবার্গের রাব্বি মুসেজ (১৭৬২-১৮৩৯), রাদুনের রাব্বি ইসরাড মেরি হাখামসহ বিপুল সংখ্যক ইহুদি রাব্বি এ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। Aqudath Yisrael আন্দোলন জায়নবাদকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। অর্থোডক্স ইহুদিদের বলা হয় হারেদি জিউস। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তারা এর বিরোধিতা করে আসছে। হারেদিরা মনে করেন জায়নবাদ ইহুদিদের বিচ্যুত করছে ধর্ম থেকে। তাদের শ্লোগান হলো 'আ জিউস ইজ নট আ জায়োনিস্ট'। তারা অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের বিরোধিতা করেন। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট যুগে আগুদাত ইসরাইল জোরালোভাবে প্রচার করে যে, ইহুদি মুক্তি কেবল মসিহের দ্বারাই সম্ভব। ১৯৩০ এর দশকে গোষ্ঠীটি ইহুদিবাদের সাথে আপস করে। ফলে ১৯৩৭ সালে রাব্বি ব্লাউ আগুদাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাটুরেই কার্টা গড়ে তোলেন। ইহুদিবাদী প্রচারণা তাদেরকে বন্য ও বর্বর হিসেবে দেখিয়েছে।[৬৬]

তারা ইসরাইলি পতাকা পোড়ায় এবং ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বরতার জন্য তারা সংক্ষুব্ধ।[৬৭]

নাটুরেই কার্টাকে খুবই গৌণ এবং রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে দেখানো হলেও এমন ইহুদির সংখ্যা কম নয়, যারা জায়নবাদ বিরোধী, যারা ইসরাইলি রাষ্ট্রতত্ত্বকে বিশ্বাস করেন না। প্রথমদিকে ফিলিস্তিনি বা আরব ইহুদিরা জায়নবাদে সাড়া দিয়েছে খুব কম। জায়নিস্ট ইহুদিরা মূলত ছিল রাশিয়ান, অস্ট্রিয়ান, জার্মান ও ব্রিটিশ। তারা সংগঠিত ও ধারাবাহিক ছিল, ফলে জিতে যায়।

---

৬৬ In a state over Israel by Simon Rocker (The Guardian) November 25, 2002

৬৭ Neturei Karta burn Israeli flags in Jerusalem by Kobi Nahshoni, Ynet news, March 2, 2010

উপনিবেশ তৈরির যাত্রা

শুরু হয় উপনিবেশ তৈরির ব্যাপক আয়োজন। ১৯ শতকের শেষের দিকে, বিশ্বের ৯৯.৭% ইহুদি এই অঞ্চলের বাইরে বসবাস করত।[৬৮]

১৮৭৮ সালে জেরুসালেম, নাবলুস আর আক্রে শহরে বসবাসরত চার লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে ইহুদি ছিল মাত্র ১৫,০০০। উসমানি নথিপত্র দেখায়, এসময় বিদেশি নাগরিক হিসেবে সেখানে অবস্থান করেন আরো ১০,০০০ ইহুদি। আরব মুসলিমরা তখন ফিলিস্তিনের ব্যাপক সংখ্যাগুরু। জায়নবাদ ইহুদিদের ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করে উপনিবেশ তৈরিতে ফিলিস্তিনে যাত্রার জন্য। ব্যাপক সাড়া আসে রাশিয়া থেকে। ১৮৮২-১৯০৪ সালে ঘটে ইহুদিদের প্রথম আলিয়া, বা গণঅভিবাসন। ২৫,০০০ ইহুদি ফিলিস্তিনে আসেন। তারা আসেন মূলত রাশিয়া থেকে। ১৯০৪-১৪ সালে হয় ইহুদিদের দ্বিতীয় আলিয়া। ৪০,০০০ ইহুদি ফিলিস্তিনে আসেন। মূলত রাশিয়া থেকে তাদের আগমন ঘটে।

১৯১৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনে ইহুদিরা হন দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু, সেখানে আরবদের সংখ্যা ছিল ৬৮৩,০০০ আর ইহুদিদের সংখ্যা ৬০,০০০।

১৯১৯-২৩ সালে ঘটে তৃতীয় আলিয়া। ৩৫,০০০ ইহুদি এ সময় ফিলিস্তিনে আসেন। রাশিয়া থেকে তারা এসেছিলেন। ১৯২৪-২৮ সালে ঘটল ইহুদিদের চতুর্থ আলিয়া। মূলত পোল্যান্ড থেকে ৮০,০০০ ইহুদির এই স্রোত এগিয়ে আসে ফিলিস্তিনে। ১৯২৯-৩৯ সালে পোল্যান্ড ও জার্মানভাষী

---

৬৮ Raphael R. Bar (1969). "Israel's Next Census of Population as a Source of Data on Jews". Proceedings of the World Congress of Jewish Studies

দেশগুলো থেকে ধেয়ে আসে ইহুদিদের পঞ্চম আলিয়া। ২৫০,০০০ ইহুদি এসময় ফিলিস্তিনে আসেন।[৬৯]

উপনিবেশ তৈরির জন্য এই গণঅভিবাসন অব্যাহত থাকে দশকের পর দশক। ১৯৪৪ সালের শেষ নাগাদ ম্যান্ডেট ফিলিস্তিনে বসবাসরত আরবদের সংখ্যা ১২ লক্ষেরও বেশি, আর ইহুদিদের সংখ্যা ৬ লক্ষের মতো। জুইশ ন্যাশনাল ফান্ড জমি অধিগ্রহণের জন্য জোগাতে থাকে টাকা। তখন ফিলিস্তিনের ৭ শতাংশ জমি কিনে বা কেড়ে নেয় ইহুদিরা, যা মোট আবাদি জমির ২০ শতাংশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জয়ের পর ব্রিটেন স্বাধীনতা দেওয়ার অঙ্গীকারে ১৯১৮ সাল থেকে ৩০ বছর ফিলিস্তিনকে নিজেদের অধীন রাখে। মূলত এই সময়টিই ফিলিস্তিনকে আরবশূন্য (বিশেষত মুসলিমশূন্য) করার জন্য কাজে লাগায় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি।[৭০]

---

৬৯ Raphael R. Bar (1969). "Israel's Next Census of Population as a Source of Data on Jews". Proceedings of the World Congress of Jewish Studies

৭০ দৈনিক যায় যায় দিন, ২৯ নভেম্বর, ফোকাস পাতা

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত

উনিশ শতকের শেষদিকে ফ্রান্স ও ব্রিটেন ছিল ইউরোপের পরাশক্তি। তাদের পাশাপাশি রাশিয়া ও আমেরিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি। প্রত্যেকেই চাইছিল উসমানি সাম্রাজ্যের পতন। এজন্য উসকে দেওয়া হলো আরব জাতীয়তাবাদ।

১৯১৬-১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানি সালতানাত ছিল জার্মানির মিত্র। ব্রিটিশ ও ফরাসিদের বিরুদ্ধে ছিল তার লড়াই। এ-সময় মিসরে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমোহনের একটি প্রস্তাব লুফে নেন মক্কার শরিফ হোসাইন। ব্রিটিশ প্রস্তাব ছিল আরবরা যদি উসমানিদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের সহায়তা করে, তাহলে ব্রিটিশরা উসমানি সাম্রাজ্যভুক্ত আরব অঞ্চলগুলোকে উপহার দেবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ফিলিস্তিন হবে এর অংশ। শরিফ হোসাইন পাবেন এর কর্তৃত্ব। আরবে শুরু হলো জাতীয়তাবাদী ঝড়। টি. এইচ লরেন্স, মাইকেল আফলাকদের মতো প্রাচ্যবিদ ও মিশনারিরা আরববাদের প্রচারক হলো। ১০ জুন ১৯১৬ শরিফ হোসাইন উসমানি সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বন করে। উসমানি প্রতিরোধ দুর্বল হয় এবং ফিলিস্তিন দখল ব্রিটেনের জন্য সহজ হয়ে যায়। ১৯১৭ সালের ১৭ অক্টোবর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের সৈন্যরা মুসলমানদের থেকে জেরুসালেম ছিনিয়ে নেয়। ১৯১৭ এর ৯ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সেনাপ্রধান জেনারেল এলেনবি প্রবেশ করেন জেরুসালেমে। দম্ভের ভাষায় বলেছিলেন, 'আজ ক্রুসেডের সমাপ্তি হলো!'

বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই ব্রিটেন ইহুদিদের আশ্বাস দিয়েছিল– ইহুদিরা যদি যুদ্ধে অস্ত্র, প্রযুক্তি, অর্থ ও গোয়েন্দা তথ্যের সহায়তা দেয়, তাহলে যুদ্ধ শেষে তাদেরকে দেবে রাষ্ট্রগঠনের সুযোগ। ফ্রান্সের সাথে ব্রিটেনের সন্ধি হয়, যাকে

বলে সাইকস-পিকো চুক্তি। এতে স্থির হয় যুদ্ধ শেষে সিরিয়া, লেবানন ও জর্দান ফ্রান্সের উপনিবেশে পরিণত হবে। ব্রিটিশ উপনিবেশ হবে হেজাজ, জর্দান ও ফিলিস্তিন। মধ্যপ্রাচ্যের এমন এক বিন্যাসের রূপরেখা, যা ইহুদিরাষ্ট্র গঠনকে নিশ্চিত করবে। এটি ছিল গোপন এক চুক্তি। যাতে রাশিয়ারও সম্মতি ছিল।[৭১]

এর মধ্য দিয়ে জাজিরাতুল আরবকে করা হয় টুকরো টুকরো, তৈরি করা হয় কিছু শাসক পরিবার, যাদের ক্ষমতা পশ্চিমা স্বার্থরক্ষার কাছে দায়বদ্ধ।

ফিলিস্তিনকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে নেওয়ার পেছনে ছিল এক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার বেলফোর জায়নবাদী নেতা ব্যারন রথচাইল্ডকে ৬৭ শব্দের এক পত্রে জানান, ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমি গড়ে তোলার জন্য যা করা প্রয়োজন, তার সবই করবে।[৭২]

এটি 'বেলফোর ঘোষণা' হিসেবে পরিচিত, যা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম ভিত্তি। বেলফোর ঘোষণার সময় ফিলিস্তিন ব্রিটেনের অধীন ছিল না। ১৯২১ সালে শরিফ হোসাইনের সন্তানদেরকে পুরস্কার হিসেবে ব্রিটেনের তরফে দেওয়া হলো জর্দান ইমারতের শাসনক্ষমতা। এর উদ্দেশ্য ছিল ইসরাইলের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত এই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখা।

---

৭১ Fromkin, David (1989). A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. New York: Owl. p 286

৭২ Schneer, Jonathan. The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict. p 342

সন্ত্রাসী গোষ্ঠী

১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো দ্য জেনারেল অর্গানাইজেশন অফ ওয়ার্কার্স ইন ইসরাইল (হিস্তাদরুত) ও জায়নবাদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হাগানাহ। যারা ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করছিল। হাগানাহর আগে কাজটি করত ইহুদি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হাশোমার। হাগানাহ ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করছিল আপন ভূমি থেকে। তারা কেবল ফিলিস্তিনিদের হত্যা করত না, যারা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তারা ইহুদি হলেও মরতে হতো। ১৯২৪ সালে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতির অভিযোগে তারা জ্যাকব দে হান নামের এক ইহুদিকে হত্যা করে। এটাই ছিল হাগানাহর প্রথম স্বীকৃত হত্যাকাণ্ড। পরে এ ধারায় জন্ম নেয় ইরগুন, স্টার্ন গ্যাংসহ বহু সন্ত্রাসী, সশস্ত্র দল।[৭৩] আইডিএফ এখন তাদেরই মেজাজের স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় বাহিনী।

---

৭৩ Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations

প্রতিরোধ আন্দোলন

মুসলমানরা প্রথমে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেছেন। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৩ অবধি এই প্রতিবাদ নানা ধাপ পার করে। ১৯২০ এর প্রথম থেকে আরব রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন ফিলিস্তিনের সুরক্ষার জন্য মুফতি আমিন আল হুসাইনি সক্রিয়ভাবে জায়নবাদের বিরোধিতা করেন। ১৯৩৬-৩৯ এর ফিলিস্তিনে আরব প্রতিরোধে তার সক্রিয়তা ছিল ব্যাপক। ব্রিটিশরা তাকে গ্রেফতার করতে চাইল। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়িয়ে তিনি বহু দেশ পেরিয়ে ইতালি ও জার্মানিতে অবস্থান গ্রহণ করেন। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে পাত্তা দেয়নি ব্রিটিশরা।

শেষ অবধি প্রাণ, ভূমি, সম্পদ ও সম্ভ্রমের জন্য অস্ত্র তুলে নিতে হলো হাতে। ১৯৩৩ সালে শুরু হলো প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদি বসতিস্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান সুফি, কবি ও ফকিহ শায়খ ইযযুদ্দিন আল কাসসাম। সিরিয়ার জাবালাহ্ শহরে জন্মগ্রহণকারী এই লড়াকু আলেমের বাবা আবদুল কাদির ছিলেন উসমানীয় যুগে শরিয়া আদালতের কর্মকর্তা এবং কাদেরিয়া তরিকার বুজুর্গ। তার দাদা ছিলেন কাদেরিয়া তরিকার প্রধান এক শাইখ। ইস্তাম্বুলের শাইখ সালিম তাইয়ারাহ ছিলেন তার প্রথম দিকের উস্তাদ। ইসরাইলি ইতিহাসবিদ টম সেগেভ তাকে আরব জোসেফ ট্রাম্পেলডোর বলে অভিহিত করেছেন।[৭৪]

জামে আল আজহারের গ্রাজুয়েট কাসসাম সিরিয়ায় ব্রিটিশ ও ফরাসি ম্যান্ডেটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তৃণমূল জনতাকে সংগঠিত করে তিনি গড়ে তোলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম। ইতালির উপনিবেশের বিরুদ্ধে

---

৭৪ Segev, 2001, p. 362-363

লিবিয়ানদের সাহায্যের জন্য তহবিল ও যোদ্ধা সংগ্রহ করতেন। সংগীত রচনা করতেন। অবশেষে তিনি ফিলিস্তিনে হিজরত করেন। কাসসাম সমাজে বেশ কিছু সদস্য সংগ্রহ করে তাদেরকে প্রায় ডজনের মতো ভিন্ন অংশে ভাগ করে দেন। এদের এক অংশ অন্য অংশের সম্পর্কে জানত না। অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষক ও শহরের শ্রমিক।[৭৫]

জিহাদের জন্য উলামার সমর্থন নিশ্চিত করেন তিনি। দামেস্কের মুফতি শাইখ বদরউদ্দিন আল-তাজি আল-হাসানি ইহুদিবাদী ও ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের ফতোয়া দেন।[৭৬]

কাসসাম ইতিমধ্যে শহরের মধ্যবিত্ত ও গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে কাজের ধারা তৈরি করেছেন। জেরুসালেমের গ্র্যান্ড মুফতি মুহাম্মদ আমিন আল-হুসাইনির সমর্থন ও প্রথম পর্যায়ে সহায়তা নিশ্চিত করেছেন। হাইফায় তিনি জামিয়াত আল-শুব্বান আল-মুসলিমিন দলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপালন করতে লাগলেন। আরব জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল হিযব আল-ইসতিকলাল আল-ফিলিস্তিনের প্রতি আকৃষ্ট শহরের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সমাজের সাথেও অর্থবহ যোগাযোগ তৈরি করলেন। কাসসামের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনিদের প্রত্যক্ষ লড়াই শুরু হয়। সামরিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রয়াসকে তিনি অধিক গুরুত্ব দিতেন। যোদ্ধাদের তিনি উন্নত চরিত্রের ওপর জোর দিতেন। অসহায়, অসুস্থদের সেবা, সমাজ ও পরিবারের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা এবং নিয়মিত নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াত করতে বলা হতো। আখলাকে শ্রেষ্ঠ না হলে জয় অসম্ভব এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সাহসী যোদ্ধা হতে হলে প্রজ্ঞা ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের প্রয়োজন। পরিবার থেকে দূরে থাকা এবং ইসলামে অনৈতিক বলে বিবেচিত কাজে জড়িত থাকা হাইফার শ্রমিক ও বস্তির বাসিন্দাদের জন্য তিনি নৈতিক উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন।[৭৭]

১৯৩৬-৩৯ সালে জাফায় প্রতিবাদী ফিলিস্তিনিদের ওপর ইহুদি মিলিশিয়া ও ব্রিটিশরা হামলা করে। হত্যা করা হয় পাঁচ হাজারের অধিক মানুষকে। এতে সহায়তা করে আরব বন্ধুরাষ্ট্রগুলো। শহিদ হন ইযযুদ্দিন

---

৭৫ Schleifer, ed. Burke, 1993, p. 172

৭৬ Milton-Edwards, 1999, p. 18

৭৭ Schleifer, ed. Burke, 1993 p. 173

কাসসাম রহ.। মৃত্যুর পর তার প্রভাবকে ব্যাখ্যা করা হয় এভাবে : 'আমরা আপনাকে মিম্বর থেকে তলোয়ারের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি...মৃত্যুর মাধ্যমে আপনি জীবনের চেয়েও বেশি বাগ্মী হয়ে উঠেছেন।'[৭৮]

সত্যিই তিনি শাহাদতের পরে জীবনকালের চেয়েও বেশি জীবিত হয়ে উঠেন। প্রতিরোধ আন্দোলন নতুন তরঙ্গ লাভ করে। নেতৃত্ব দেন তার আধ্যাত্মিক উত্তরসুরি শায়খ ফারহান সাদি, আবু ইবরাহিম আল-কবির ও আতিয়াহ আহমাদ, আওয়াদ ফাসাইল প্রমুখ। প্রবল প্রতি-আক্রমণের ধারা তৈরি হয়। হাগানাহদের পাশাপাশি ব্রিটিশরাও এর উত্তাপ অনুভব করে। তীব্র ও ধারাবাহিক কমান্ডো অভিযানে ১০ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য প্রাণ হারায়। বন্দি হয় ৫০ হাজার। ব্রিটিশরা একে দমাতে পারছিল না সামরিকভাবে। শেষ অবধি রাজনৈতিক চাল অবলম্বন করে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনে ব্রিটিশরা কাজ করবে না। ফিলিস্তিনকে ফিলিস্তিনিদের হাতে ছেড়ে দেবে।

প্রতিরোধ আন্দোলনের চিন্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। কারণ ব্রিটিশরা সত্যিই বন্ধ করেছিল ইহুদি বসতি নির্মাণ। কিন্তু এটি কি তাদের প্রতারণা? এ ছিল উদ্বেগপূর্ণ জিজ্ঞাসা। অবশেষে ব্রিটিশ প্রতারণাই প্রমাণিত হলো।

---

৭৮ আল আহরাম, কায়রো মিশর, ২২ নভেম্বর, ১৯৩৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় বিধ্বস্ত। এসময় ফিলিস্তিনের দিকে ইহুদিদের ঢল নামতে থাকে। সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো স্থানীয়দের হত্যা করেছে রেড ইন্ডিয়ানদের মতো। যুদ্ধশেষে বলা হলো হলোকাস্ট ঘটে গেছে। ইহুদিরাষ্ট্র তৈরির জন্য ষাট লক্ষ ইহুদির প্রাণদানের শর্ত পূর্ণ হয়েছে। জার্মানির নাৎসিরা ৬০ লক্ষ ইহুদিকে খুন করেছে।[৭৯]

ইহুদিদের প্রতি তৈরি করা হলো বৈশ্বিক আবেগ ও বিশ্বশক্তির দায়। আমেরিকা প্রবলভাবে এগিয়ে আসে ইহুদিদের রাষ্ট্রগঠনে। ব্রিটিশদের চেয়ে বরং ইহুদিরা আমেরিকাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে থাকে। যুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরে জায়নবাদী সম্মেলনে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালে ইঙ্গ-মার্কিন জোট গঠিত হয়। এ জোটের তিনটি দাবি ছিল মুখ্য : ১. ফিলিস্তিনে এক লক্ষ ইহুদির পুনর্বাসন সম্পন্ন করতে হবে। ২. ফিলিস্তিনের ভূমি ক্রয়ে ইহুদিদের জন্য কোনো বিধি-নিষেধ থাকতে পারবে না। ৩. বৈশ্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ফিলিস্তিনে রাষ্ট্রগঠন করতে হবে।

---

৭৯ Longerich, Peter (2010). Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the Jews. Oxford University Press

ইসরাইল রাষ্ট্রের সূচনা ও নাকবা

১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে পাস করা হয় পার্টিশন প্রস্তাব। সিদ্ধান্ত হয় ফিলিস্তিনের বুকে একটি আরব রাষ্ট্র ও একটি ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের এবং জেরুসালেম আর তার আশপাশের এলাকার ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েমের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইহুদিদের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের পার্টিশন প্রস্তাব সমর্থন করেন। ফিলিস্তিনি প্রতিনিধিরা একে করেন প্রত্যাখ্যান।

১৯৪৮ সালের মে মাসের ১৪ তারিখ ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষিত হয়। ১০ মিনিটের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান ইসরাইলকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অবিলম্বে স্বীকৃতি দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন। ১৫ মে শুরু হয় ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ ও ধ্বংসযজ্ঞ। সাত লাখের বেশি ফিলিস্তিনিকে নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়। আরবিতে এ বিপর্যয়কে বলা হয় 'নাকবা'। ইহুদিবাদী নেতা মোনাচেম বেগিনের নেতৃত্বে 'ইরগুন' সন্ত্রাসীরা 'দির ইয়াসিন' গ্রামের নিরস্ত্র জনগণের ওপর হামলা চালিয়ে গ্রামটির শত শত নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে। ওই সন্ত্রাসীরা বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনির লাশ গ্রামটির কূয়ায় নিক্ষেপ করে এবং কিছু লাশ কূয়ার পাশে স্তূপ করে রাখা হয়। যেন ফিলিস্তিনিরা বুঝতে পারে বাঁচতে হলে ফিলিস্তিন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।[৮০]

বেগিন পরে হন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী। পান নোবেল শান্তি পুরস্কার! দির ইয়াসিনের গণহত্যাকে তিনি ইসরাইলের অস্তিত্বের জন্য জরুরি কাজ

---

৮০ غازي حسين، « الجيش الإسرائيلي والهولوكوست على الشعب الفلسطيني»، مجلة الفكر السياسي، اتحاد كتاب سوريا، دمشق

বলে আখ্যা দেন। এই নাকবার ধারাবাহিকতা পরবর্তীতে ফিলিস্তিনিদের ওপর কী নিষ্ঠুরভাবে জারি থেকেছে, তা দেখেছে বিশ্বের বিবেক! এমনকি পশ্চিমা একপাক্ষিক দৃষ্টিও একে অস্বীকার করতে পারেনি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বিস্তৃত প্রতিবেদন তার সাক্ষী।[৮১]

১৫ মে নাকবা দিবস হিসেবে পালিত হয় দুনিয়াব্যাপী। ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর সাধারণ পরিষদ দিবসটিকে অনুমোদন দেয়।

৮১ Human Rights Watch: April 27, 2021 A Threshold Crossed Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution

দুই রাষ্ট্রতত্ত্ব

ইসরাইল প্রতিষ্ঠার আগেই ব্রিটিশ সরকার দুই রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিল। ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ পিল কমিশন ফিলিস্তিনকে দুই ভাগ করে ৭৫ শতাংশ আরব ও বাকি অংশে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করে। তবে তিন ধর্মের পবিত্র স্থান জেরুসালেমকে জাফাসহ ব্রিটিশ ম্যান্ডেট ও আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে রাখার কথাও বলা হয়।[৮২]

আরব ও ইহুদি-দুই পক্ষই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ২৯ নভেম্বর ১৯৪৮ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ জারি করে তার ১৮১ নম্বর রেজুলেশন। আমেরিকার চাপ আর রাশিয়ার প্রবল সমর্থনে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে একে মঞ্জুর করা হয়। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ৫৬ শতাংশ ইহুদি ও ৪৩ শতাংশ ফিলিস্তিনি আরবদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রশ্নে ভোটাভুটি হয়েছিল। ৩৩-১৩ ভোটে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। জেরুসালেমকে আলাদাভাবে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল।[৮৩]

আরবরা এ প্রস্তাবে আপত্তি জানান। কারণ ফিলিস্তিনে তখন ইহুদিরা ১১ শতাংশের বেশি জমি ভোগ করত না। এতে ফিলিস্তিনিদের যে ভূমি দেওয়া হয়, তা হলো নেগেভ মরুভূমিসহ পশ্চিমতীর, গাজা স্ট্রিপের মতো অসুবিধাজনক ও দরিদ্রতম এলাকা।

কিন্তু ইসরাইলকে দেওয়া হয় উপকূলরেখার অধিকাংশ অঞ্চল, ফিলিস্তিনের সবচেয়ে উর্বর কৃষিজমি এবং গ্যালিলের সমৃদ্ধ এলাকা।

---

৮২ Elie Podeh, Chances for Peace: Missed Opportunities in the Arab-Israeli Conflict, University of Texas Press 2015

৮৩ ibid

ইহুদিদের প্রতি পরাশক্তিগুলোর সহানুভূতি ছাড়া এই বিভাজনের কোনো ভিত্তি ছিল না।

আরবরা প্রশ্ন তোলেন হলোকাস্টের অপরাধের শাস্তি কেন আরবদের পেতে হবে? এই বিভাজনতত্ত্বকে বলা হয় দুই রাষ্ট্র সমাধান। যা ১৯৬৭ সালের সীমানার ভিত্তিতে ইসরাইল রাষ্ট্রের পাশাপাশি ফিলিস্তিনের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বলে। এই তত্ত্বকে হাজির করা হলেও দুই রাষ্ট্রের সীমানা চিহ্নিত করা হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালের সীমানাকে ভিত্তি করেই দুই রাষ্ট্র সমাধানের আলোচনা অগ্রসর হয়। কিন্তু ইসরাইল প্রতিনিয়তই নিজের সীমানা সম্প্রসারণ করে চলেছে। ফিলিস্তিনিদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে, গণনিধন করেছে এবং তাদের ভূমিতে অবৈধ বসতি নির্মাণ অব্যাহত রেখেছে।

আরবদের ভূমিকা

১৯৪৮ সালের ১৫ মে। সদ্যঘোষিত ইসরাইল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে মিসর, সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ইরাকের সেনাবাহিনী। শুরু হয় যুদ্ধ। প্রথম দিকে আরবরা কিছুটা সুবিধা করতে পেরেছিল। কিন্তু তারা জানত না নিজেদের দুর্বলতা, প্রতিপক্ষের পরিকল্পনা ও সামর্থ্য। ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া ছিল তাদের মুরুব্বি। এদেরকে তাই খুব বেশি চটানোর সুযোগ ছিল না। আরবদের ছিল না সামরিক প্রস্তুতি। তাদের কি যথাযথ পরিকল্পনা ছিল? না। তারা কেবল আক্রমণ করছিল ইসরাইলের সেই ভূমিতে, যা তার জন্য বরাদ্দ করেছিল জাতিসংঘ। তাদের মধ্যে ছিল না যথাযথ সমন্বয়। তাদের নেতৃত্ব ছিল দ্বিধান্বিত। সংখ্যায় তারা বেশি হলেও যুদ্ধে অচিরেই এর প্রভাব পড়ে। ইহুদিবাদীরা দশকের পর দশক ধরে এরকম একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। নতুন রাষ্ট্রের চেতনায় উদ্বুদ্ধ জায়োনিস্টরা অপ্রস্তুত প্রতিপক্ষকে শিক্ষা দিতে উদগ্রীব অপেক্ষায় ছিল। যুদ্ধে তারা সক্ষমতা দেখায়। তাদের সামনে আরবরা দিগ্‌ভ্রান্ত, লক্ষ্যহীন। তারা পিছু হটতে থাকে।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে আরব দেশগুলো যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট ২২% ভূখণ্ড মিশর ও জর্দানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। জর্দান পায় পশ্চিমতীর, মিশর পায় গাজা। এ সন্ধির পর জাতিসংঘ ইসরাইলকে সদস্যপদ দেয়। তারপর দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে থাকে।[৮৪]

---

৮৪ Benny Morris (2008). 1948: A history of the first Arab-Israeli war. Yale University Press

এ যুদ্ধ ইসরাইলকে দেয় সেই শক্ত ভিত্তি, যার মাধ্যমে সুগম হয়েছে পরবর্তী পথ। আরবরা যথার্থ কাজটি ছাড়া সকল পথেই হেঁটেছে। ইতিপূর্বে কয়েকটি আরব দেশ মিলে স্যালভেশন আর্মি গঠন করেছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান জানানো হয়। তাদের সাড়া ছিল বিপুল। দামেস্কের কাতনায় তাদের প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। ব্রিটেন একে হুমকি হিসেবে নিলো। আরব নেতাদের জানাল ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্রীকরণ আর আর আরবদের সাথে ব্রিটিশ বন্ধুত্ব একসাথে চলবে না। আরব লীগ এতেই চুপসে যায়।[৮৫]

আবদুল কাদের হুসাইনির নেতৃত্বে ফিলিস্তিনের গণআন্দোলনের সৃষ্টি হলো। মুসলিম দুনিয়ায় এর ঢেউ লাগল। ইখওয়ানুল মুসলিমিন শক্ত ভূমিকা গ্রহণ করল। ১৯৪৮ সালের ৩ এপ্রিল আরব লীগের কাছে প্রতিরোধ যোদ্ধারা চাইল অস্ত্র। তারা এতে সাড়া দেয়নি। অপরদিকে ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের একেবারে উচ্ছেদে গ্রহণ করে প্লান দালেত বা প্লান ডি প্রকল্প। ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ তা চূড়ান্ত হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন ডেভিড বেন গুরিয়ান। এটি মূলত ফিলিস্তিনিদের ফিলিস্তিন থেকে নিশ্চিহ্ন করার সেই পরিকল্পনা, যা বাস্তবায়িত হবে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও দখলদারির মাধ্যমে। এর বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয় হাগানাহ, ইরগুন, লেহি, উইংগেট, জুইস এজেন্সি ইত্যাদি সশস্ত্র ইহুদি গোষ্ঠী।

ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় সেখানে ছিলেন বহুসংখ্যক ইখওয়ানি স্বেচ্ছাসেবী। আরব বাহিনী তাদেরকে খেদিয়ে দেয়। তাদের অনুপস্থিতিতে ইহুদিবাদী গোষ্ঠীগুলো এলাকাটি দখল করে নেয়। ফিলিস্তিনি ভূমিগুলোকে নরকে পরিণত করে তারা।

নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে লাখ লাখ সর্বস্বহারা ফিলিস্তিনি পালাতে থাকেন। ১৯৪৮ এর মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত সাত লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী হন।

নিজেদের ভূমিতে ফিলিস্তিনিরা নিজেদের যুদ্ধটি করবেন, সেই পথে বাধা তৈরি করেছে আরব-উদ্যোগ। চারটি আরব-ইসরাইল যুদ্ধ হয়েছে। আরবরা হেরেছে প্রতিবার। ফিলিস্তিন হয়েছে আরো বিপন্ন। জায়নবাদীরা অস্ত্রে, প্রযুক্তিতে, অর্থে, কৃষিতে, শিল্পে, প্রতিপত্তিতে হয়েছে আরো বলবান।

---

৮৫. عماد جاد، «الإرهاب الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مجلة الوحدة، العدد (67) ، لعام 1990

এর ওপরে আছে আমেরিকা-ইউরোপের অন্ধ মদদ। ইসরাইল ফিলিস্তিনের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে থাকে। গোল্ডমেয়ার বলেছিলেন, 'ফিলিস্তিনি বলতে কিছু নেই। এটা এমন নয় যে ফিলিস্তিনে ফিলিস্তিনি বলে কোনো জাতি ছিল এবং তারা নিজেদের ফিলিস্তিনি জাতি বলে দাবি করত, আর আমরা এসে তাদের বিতাড়িত করেছি ও তাদের দেশ দখল করে নিয়েছি। না, ফিলিস্তিনি জাতি বলতেই কিছু নেই।'[৮৬]

৮৬ ডেইলি সানডে টাইমস, ১৫ জুন, ১৯৬৯

ছয়দিনের যুদ্ধ

১৯৬৭ সালে ঘটে তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। এতে তিনটি আরব রাষ্ট্র পরাজিত হয়। জেরুসালেম, পশ্চিম তীর, গাজা এবং গোলান মালভূমিসহ সম্পূর্ণ ফিলিস্তিনি ভূমি দখল করে নেয়। এ যুদ্ধ ছিল ইসরাইলের প্রত্যাশার প্রতিফলন। দীর্ঘদিন ধরে সে অপেক্ষা করছিল পশ্চিম তীরসহ সমগ্র ফিলিস্তিনি ভূমি দখল করবে। ১৯৬৭ সাল তাদেরকে সে সুযোগই এনে দিয়েছিল মাত্র।[৮৭]

১৯৪৮ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও আরবদের হাতে ছিল ফিলিস্তিনের ২৮% ভূমি, কিন্তু ছয় দিনের যুদ্ধের পর ১০০% ভূমিই ইসরাইলের হাতে চলে যায়। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ ইসরাইলকে যা দিলো, ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের যুদ্ধও তা দেয়নি। ইসরাইল কৌশলগত গভীরতা অর্জন করল। আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরাজয়ভীতি স্থায়ীভাবে চেপে বসল। তারা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ-পূর্ব সীমান্ত মেনে নিলেন।[৮৮]

---

৮৭ Ten Myths About Israel , Ilan Pappé, Verso Publications , April 2017

৮৮ ibid

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি

মিসরের প্রেসিডেন্ট সাদাত মনে করেন যে, কোনো নাটকীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান হবে না। ১৯৭৭ সালে সাদাত ইসরাইল গমন করেন এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় ওয়াশিংটন, মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে সমঝোতার দলিল স্বাক্ষরিত হয়। এটাই ইতিহাসে 'ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি' নামে পরিচিত। চুক্তি অনুযায়ী সিনাই উপদ্বীপ মিশর ফিরে পায়। পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকায় পর্যায়ক্রমে ইসরাইলি সামরিক ও বেসামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়।[৮৯]

কিন্তু এ স্বায়ত্তশাসন ছিল খুবই সীমিত। সামাজিক ও পূর্ত বিভাগের কিছু কাজকর্ম করা ছাড়া রাজনৈতিক কোনো ভূমিকা গাজা ও পশ্চিমতীরের জন্য বহাল থাকেনি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব মূলত থাকে ইসরাইলের হাতে। এসব এলাকায় ইসরাইলি সৈন্য রাখারও ব্যবস্থা হয়। এ চুক্তি সম্মতিমূলক পন্থায় ইসরাইলি দখলকে পাকাপোক্ত করে। চুক্তির ফলস্বরূপ সাদাত ও বেগিন নোবেল পুরস্কার পেলেন।

---

৮৯ Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, 28 September 1995

পিএলওর বিবর্তন

আত্মরক্ষার প্রয়োজন থেকে ফিলিস্তিনে জন্ম নিলো প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)। ১৯৬৪ সালের ঘটনা এটি। এর আগে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ১৯৫৯ সালে গঠিত হয় ফাতাহ। পিএলওর ছাতার নিচে অনেকগুলো সংগঠন ছিল। বেশির ভাগ সংগঠন ছিল বামপন্থি মতাদর্শে বিশ্বাসী। প্রতিরোধী চরিত্রের কারণে ১৯৯১ সালে মাদ্রিদ সম্মেলনের আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল একে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে দেখত। ১৯৯৩ সালে দলটি প্রতিরোধ আন্দোলন পরিহার করে এবং অসলো চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইল রাষ্ট্রকে মেনে নেয়। অসলো চুক্তি হচ্ছে ইসরাইল এবং ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার মধ্যকার একাধিক চুক্তির সমাহার। ১৯৯৩ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অসলো চুক্তি ১ সই হয়, পরে মিশরের তাবায় ১৯৯৫ সালে স্বাক্ষরিত হয় অসলো চুক্তি ২।[৯০] এ চুক্তিতেও ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের স্বশাসনের আংশিক অধিকার স্বীকার করে এবং প্রথমে পশ্চিম তীরের জেরিকো এবং তারপর গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মত হয়। চুক্তিটি শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি ইসরাইল ও তার পৃষ্ঠপোষকদের কারণে। তারা ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের দেশে ফেরার প্রশ্ন এড়িয়ে যায়, পশ্চিম তীরে অবৈধ ইহুদি বসতি ও নতুন বসতি নির্মাণের বিষয় এড়িয়ে যায়, জেরুসালেমে মুসলিমদের প্রাপ্য অধিকার এড়িয়ে যায় এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের মূল প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করে।

চুক্তি সম্পন্ন করায় আমেরিকা ও ইসরাইল সরকারিভাবে পিএলওকে ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করে। পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং তৎকালীন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

---

৯০ Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, 28 September 1995

ইন্তিফাদা ও হামাস

সব রকমের শান্তি আলোচনা সত্ত্বেও ইসরাইল একদিনের জন্যও বন্ধ করেনি সীমানা সম্প্রসারণ। ফিলিস্তিনি ভূমিতে দখলদারদের বসতি নির্মাণ চলমান ছিল। হত্যা, উচ্ছেদ, নিষ্ঠুরতা ও জেনোসাইডের ধারাও ছিল গতিমান। ফিলিস্তিনের মানুষ শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতি আর সইতে পারছিল না। শুরু হলো ইন্তিফাদা।

ইন্তিফাদা মানে উত্থান, জাগরণ। ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে মসজিদ থেকে শুরু হয় এই গণপ্রতিরোধ। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য প্রথম ইন্তিফাদা শুরু হয়েছিল ১৯৮৭ সালে এবং চলে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত। এই আন্দোলন অনেকটা অসহযোগ আন্দোলনের মতো। পাথর ছুড়ে দখলদারদের প্রতি ঘৃণা জানানো। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজেক রবিন ঘোষণা করলেন 'জবরদস্তি, শক্তি এবং আঘাত' দিয়ে ইন্তিফাদার জবাব দেওয়া হবে। ইন্তিফাদার প্রথম বছরেই ইসরাইল নিজের হিসাবে ৩১১ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছিল যাদের ৫৩ জনই ছিল ১৭ বছরের কম বয়সী।[৯১] ইন্তিফাদার প্রথম দুই বছরেই ২৩ থেকে ২৯ হাজার ফিলিস্তিনি শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভেঙে ফেলে ইসরাইলি বাহিনী।[৯২]

স্বাধীনতার গণআকাঙ্ক্ষাকে সংঘবদ্ধ ও ধারাবাহিক লড়াইয়ে রূপায়িত করতে ১৯৮৭ সালে জন্ম নিলো রাজনৈতিক সংগঠন হামাস। শেখ আহমদ ইয়াসিন ও আবদুল আজিজ রানতিসি এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৯০-এর দশকের

---

৯১ How Fighting Ends: A History of Surrender, Oxford University Press 2012 pp.417-433 p.426

৯২ Edward Said (1989), Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation. South End Press

শেষের দিকে ইসরাইলি দখলকে সে অব্যাহতভাবে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে। ইসরাইল-পিএলও পারস্পরিক স্বীকৃতিকে সে প্রত্যাখ্যান করে এবং অসলো চুক্তির বিরোধিতা করে। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে গাজা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে ইসরাইল। ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে ফিলিস্তিনি সংসদীয় নির্বাচনে দলটি অধিকাংশ আসন জিতে। পশ্চিমারা ফাতাহের পক্ষ নেয়। ফলে শুরু হয় হামাস-ফাতাহ দ্বন্দ্ব। এর সমাধান হিসেবে হামাস পশ্চিমতীরের শাসনভার ফাতাহের হাতে ছেড়ে দেয়। ২০০৭ এর জুন থেকে গাজার শাসনকর্ম আঞ্জাম দিচ্ছে হামাস। কিন্তু তখন থেকেই ইসরাইল ও মিসর গাজা উপত্যকাকে অবরুদ্ধ করে দেয়। স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয় গাজা। হামাস ইসরাইলের দখলদারিকে কবুল করে সর্বমুখী সংকটেও সন্ধি করতে রাজি হয়নি। কারণ 'গলার মাঝে ছুরি ও সন্ধি কখনো একসঙ্গে চলে না।'

ফিলিস্তিনিদের গণকবর কিংবা বন্দিশালা

সর্বাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে আছে ফিলিস্তিন। ইসরাইলি হামলা-নির্যাতন-হত্যা-দখলদারি ফিলিস্তিনের দিনলিপি রচনা করে। ফিলিস্তিনের প্রতিদিনই একেক নাকবা। ১৯৪৮ ছিল রক্তবন্যার বছর। ইয়াসিন টেম্পলে ১০ ডিসেম্বরের গণহত্যা, লড নগরীতে ১১ জুলাইয়ের গণহত্যা, ১৯৫৩ সালের ১৪ অক্টোবর কিবায়া গণহত্যা, ১৯৫৬ এর অক্টোবরে কাসেম জনপদে গণহত্যা, পশ্চিমতীরের কালকিলিয়ায় একের পর এক গণহত্যা, ১৯৮২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর শাবরা-শাতিলায় শরণার্থী ক্যাম্পে ৫০০০ ফিলিস্তিনি ও লেবাননি হত্যা, ১৯৮৭ সালে ১৫০০ সাধারণ ফিলিস্তিনি হত্যা, ১৯৮৮ সালে মস্তারাফিম চক্রের দ্বারা এহুদ বারাকের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনি নেতৃবৃন্দকে হত্যা, ১৯৯১ সালে পশ্চিমতীরে উচ্ছেদ ও ধারাবাহিক হত্যা, ১৯৯৫-এর ২৫ এপ্রিল আল ইবরাহিমি মসজিদে গণহত্যা, ১৯৯৬ এর ১৮ এপ্রিল কানার শরণার্থী শিবিরে গণহত্যা...এ যেন অন্তহীন এক হত্যার ধারা।[৯৩]

দুই হাতে রক্ত ও লাশ নিয়ে ইসরাইল বহু চুক্তি, শান্তিপ্রক্রিয়া, বন্ধুত্ব বৃদ্ধির কত আয়োজন করেছে! এর মধ্যেই শত শত গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, অগণিত ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া, কৃষিখেত, জলাধার, দোকানপাট, কলকারখানা থেকে নিয়ে মসজিদ-স্কুল-গির্জা ধ্বংস করা প্রতিনিয়ত চলমান। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২২ পর্যন্ত ইসরাইল এক লাখ ৩৫

---

৯৩ আল ইরহাবুল আলামি : মান ইয়াসনাউহু ওয়া মান ইয়ামনাউহু, ড. আবদুল মুহদি আবদুল কাদের, কায়রো, মিসর, ২০০৩

হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে। এদের মধ্যে ২১ হাজার শিশু এবং ২৬০০ তরুণী ও নারী।[৯৪]

কারাগারে যে বর্বরতা চলে, তার কোনো সীমা নেই। স্বাধীনতা কামনা করেন এমন যে কাউকে হত্যা বা বন্দি করার জন্য কোনো আইনের তোয়াক্কা নেই। বিগত কয়েক বছরে ইসরাইল গুম ও গ্রেফতার করেছে ফিলিস্তিনের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, শত শত শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, অধিকারকর্মী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মীদের। হাসপাতাল, এম্বুলেন্স কিংবা পানির ট্যাঙ্ক ধ্বংস তার নিয়মিত অনুশীলনের মতো। বিদ্যালয়ে মাইন পুতে রাখা এবং শিশুদের ছিন্নভিন্ন করা, কৃষিপণ্য ও পানিতে বিষাক্ত পদার্থ মিশিয়ে ফিলিস্তিনিদের মৃত্যু নিশ্চিত করার মতো অপরাধ নিয়মিত ব্যাপার। শিক্ষিতদের জন্য বরাদ্ধ রাখা হয়েছে বেকারত্ব, ব্যবসাকে করা হয়েছে ধ্বংস, বেঁচে থাকার সকল উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে ফিলিস্তিনকে বানিয়েছে মানবাধিকার, বিবেক ও মানবতার বধ্যভূমি।[৯৫]

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, ফিলিস্তিনিদেরকে মাতৃভূমি গাজায় অবাধে চলাফেরা করতে বাধা দেবার কারণে তাদের জীবন হচ্ছে বাধাগ্রস্ত, এর মাধ্যমে লাখ লাখ ফিলিস্তিনির ওপর নিপীড়ন ও বৈষম্যের নিষ্ঠুর বাস্তবতা ফুটে উঠেছে।

এখানে দেশত্যাগই আপনার জন্য একমাত্র বিকল্প। নতুবা হয় মরো, নয় তোমার জন্য আছে মরণের চেয়েও দুর্বিষহ গাজার জীবন! গাজা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত কারাগার।[৯৬]

---

৯৪ পার্স টুডে, ২০০০ সাল থেকে ইসরাইল ১ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে; সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৩

৯৫ আল ইরহাবুল আলামি : মান ইয়াসনাউহু ওয়া মান ইয়ামনাউহু, ড. আবদুল মুহদি আবদুল কাদের, কায়রো, মিসর, ২০০৩

৯৬ বিবিসি, ১২ অক্টোবর ২০২৩

গণহত্যার লাইসেন্স

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ২৭ এপ্রিল ২০২১। ২১৩ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের পরিকল্পিত আগ্রাসনের চিত্র ফুটে উঠেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দেখায় কীভাবে সাজানো প্ল্যানের আওতায় ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করে চলছে ইসরাইল। সংবাদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সিবিসি একে তখন প্রকাশের যোগ্য মনে করল না। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কুকুর বো'র ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার খবরটি তারা গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করতে ভুল করেনি। পর্তুগিজ ওয়াটার ডগ প্রজাতির কুকুরটিকে তারা 'হোয়াইট হাউস সেলিব্রেটি' বলে বিশেষ সম্মানসূচক বিশেষণ দিয়ে যথেষ্ট কান্নাকাটি করে নিউজ প্রচার করেছে।[৯৭]

ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে, এটা কুকুরের অসুস্থ হওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়! পশ্চিমা মিডিয়ার এ অবস্থান পশ্চিমা শাসকবর্গের অবস্থানের সমান্তরাল। প্রধান দুই দৈনিক–নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্ট এবং দুটি সাপ্তাহিক-দ্য নিউ রিপাবলিক ও দ্য নেশন-এর ১৯৭০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ছাপা হওয়া সব মন্তব্য প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করেছেন ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজোনার অধ্যাপক মাহা নাসের। এই কাগজগুলোর এত বছরের সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় ঘেঁটে তিনি দেখান, ফিলিস্তিনিদের অধিকার, রক্ত, প্রাণ ও যন্ত্রণার প্রতি নির্মম অন্ধত্বকেই তারা সাংবাদিকতার নীতিতে পরিণত করেছে!

---

৯৭ সারফুদ্দীন আহমদ: প্রথম আলো; ১৮ মে, ২০২১

সেন্টার ফর মিডিয়া মনিটরিং ২০১৮ থেকে ২০১৯ সাল–এই এক বছরে গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি নিপীড়নের ঘটনাসমূহে মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে। তার মধ্যে ১৮২টি ঘটনাই মূলধারার গণমাধ্যম চেপে গেছে। এর মধ্যে এএফপি, রয়টার্স ও এপি-এই তিনটি বিশ্বখ্যাত 'নিরপেক্ষ' বার্তা সংস্থা চেপে গেছে ১৪৩টি খবর।

যখন খবর পরিবেশন করা হয়েছে, সেখানে ঘটানো হয়েছে ভয়ঙ্কর বিকৃতি। কোনো ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে মারল ইসরাইলি সৈন্য। তখন তারা শিরোনাম করবে, 'সংঘর্ষে বালক নিহত'। এখানে বালকটিকে 'ফিলিস্তিনি বালক' বলা হবে না। নিহত হওয়ার আগে যে 'সংঘর্ষ' হয়েছিল, তার প্রমাণ হিসেবে বলা হবে, 'ওই বালক পাথর ছুড়ে ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছিল'। অনেক সময় 'কিলড' শব্দটি ব্যবহার না করে সেটিকে আরও মোলায়েম ভাষায় বলা হয়, 'ডাই'য়িজ ফ্রম উন্ডস ইন বর্ডার আনরেস্ট' (সীমান্ত উত্তেজনার সময় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা গেছে)। কিন্তু যখন কোনো ফিলিস্তিনি ছুরি দিয়ে ইসরায়েলের কাউকে আঘাত করে এবং সেই আঘাতে যদি সেই ইসরায়েলি নিহত হয়, তাহলে এসব বার্তা সংস্থার বর্ণনার ভাষা আমূল বদলে যাবে। সেই খবরের বারবার 'স্ট্যাবস', 'কিলস'- এসব শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে।[৯৮]

ফিলিস্তিনিদের নির্বাসিত করে, হত্যা করে তাদের ঘরবাড়ি দখল করল ইসরাইল। সেখানে বানাল দখলদার বসতি। এমতাবস্থায় সর্বহারা কোনো ফিলিস্তিনি যদি প্রতিরোধ করে, সেটা পশ্চিমা মিডিয়ার কাছে সন্ত্রাস, যদি কেউ হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, তাহলে তার নাম করে গণহত্যা চালাবে ইসরাইল। পশ্চিমা রাজনীতি ও মিডিয়ার কাছে এর নাম হলো ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার। যা ইসরাইলের যেকোনো জেনোসাইডকে দিয়ে আসছে অন্ধ অনুমোদন।

---

৯৮ সারফুদ্দীন আহমদঃ প্রথম আলো; ১৮ মে, ২০২১

গ্রেটার ইসরাইল, টেম্পল মাউন্ট ও ৭ অক্টোবর

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পূর্ব জেরুসালেমের ওল্ড সিটিতে মুসলিমদের প্রথম কিবলা আল-আকসা মসজিদ। এর প্রাঙ্গণে আছে কুব্বাতুস সাখরা বা ডোম অব দ্য রক। একে ভেঙে তৃতীয় টেম্পল বানাতে চায় ইহুদিবাদ। আইন অনুযায়ী পূর্ব জেরুসালেমের ভূমি দখল ও তা অধিগ্রহণ করা নিষিদ্ধ। ইসরাইল ওল্ড সিটি ও আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণসহ পুরো জেরুসালেমকে নিজেদের সার্বভৌম ভূখণ্ড হিসেবে দাবি করে আসছে। ১৯৮০ এর দশকে 'জিউস আন্ডারগ্রাউন্ড' নামে একটি কট্টরপন্থি ইহুদি গোষ্ঠী ডোম অব দ্য রক ভেঙে ফেলার চক্রান্ত করে। 'টেম্পল মাউন্ট ফেইথফুল' নামে কট্টরপন্থি একটি ইহুদি গোষ্ঠী মসজিদ ভাঙতে এখন সক্রিয়।

সবচেয়ে বেশি সক্রিয় আছে 'টেম্পল মাউন্ট গ্রুপস' যার অধীনে আছে ২০টির বেশি উগ্রপন্থি গোষ্ঠী। টেম্পল মাউন্ট ফেইথফুল গোষ্ঠীও প্রভাবশালী। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ গোষ্ঠীর বর্তমান নেতা রাফায়েল মরিস। তার দাবি 'টেম্পল মাউন্ট আমাদের ও শুধুই আমাদের; আর সেখানে অন্য কারও স্থান নেই, যখন আমরা তা বলতে পারব, তখনই আমরা শুধু টেম্পল মাউন্ট নয়, একই সঙ্গে জর্দান ও সিরিয়াও জয় করতে পারব। এর মধ্য দিয়ে ইসরাইলের সমগ্র ভূখণ্ড নিয়ে একটি সত্যিকার ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।'[৯৯]

---

৯৯ আল-জাজিরা, পূর্ব জেরুসালেম, প্রকাশ : ২১ এপ্রিল ২০২৩

গ্রেটার ইসরাইল প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ ভেঙে টেম্পল বানাতে হবে। তবে টেম্পল তৈরির আগে কুরবানি দিতে হবে লাল গরু! এর অনুপ্রেরণা রয়েছে বাইবেলে।[১০০]

সেই কুরবানির আয়োজন করে মসজিদ ধ্বংস সম্পন্ন করার পুরো প্রস্তুতি নিয়েছিল চরমপন্থি ইহুদিরা। কিন্তু মসজিদ ধ্বংস করলে মুসলিম দুনিয়ার প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ। সেটা যেন না হয়, এজন্য আরব রাষ্ট্রগুলোকে আব্রাহাম অ্যাকর্ড-এর বন্ধনে আবদ্ধ করার আয়োজন ছিল। এর আওতায় সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন ইসরাইলের সাথে বন্ধুত্ব চুক্তি করে। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে এটি কার্যকর হয়। সৌদি আরবও এই প্রক্রিয়ায় এগিয়ে আসে আমেরিকার মধ্যস্থতায়। বস্তুত সৌদি আরবের এই বন্ধুত্বযাত্রা ছিল ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও বায়তুল মাকদিসের প্রশ্নে আরবদের দায়িত্বের কফিনে শেষ পেরেক। এর মাধ্যমে ইসরাইল সব ধরনের অপরাধ থেকে এক ধরনের দায়মুক্তি পেতে যাচ্ছে। ইহুদিবাদী বিচারে এখনই টেম্পল নির্মাণের সময়। এরপর পুরো প্রতিশ্রুত ভূমি দখলের পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করবে ইসরাইল।

এ পরিস্থিতিতে হামাস নজিরবিহীন হামলা করল ইসরাইলে। অক্টোবরের ৭ তারিখ এ আক্রমণে নিহত হয় সৈন্যসহ প্রায় এক হাজার ৩০০ মানুষ। এ আক্রমণ শুধু ইসরাইল নয়, বরং পশ্চিমা দুনিয়াকেও কাঁপিয়ে দিলো।

হামাস জানাল, দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো নৃশংসতার জবাবে এই সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। 'আমরা চাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গাজায়, ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর এবং আমাদের পবিত্র স্থাপনা আল-আকসায় ইসরাইলি নৃশংসতা বন্ধে উদ্যোগ নেবে। এগুলোই হামাসের এই অভিযানের কারণ।'[১০১]

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ৭ অক্টোবর ইসরাইলে যে হামলা চালায়, তা 'শূন্য থেকে' হয়নি বলে মন্তব্য করেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। ২৪ অক্টোবর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের মানুষ

---

১০০ গণনাপুস্তক ১৯ : ২

১০১ আল জাজিরা, ০৮ অক্টোবর ২০২৩

৫৬ বছর ধরে শ্বাসরুদ্ধকর দখলদারির শিকার হয়েছেন। তারা তাদের ভূখণ্ড বসতিতে পরিণত এবং সহিংসতায় জর্জরিত হতে দেখেছেন। তাদের অর্থনীতি থমকে গেছে। এখানকার বাসিন্দারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে। তাদের দুর্দশার রাজনৈতিক সমাধানের আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।[১০২]

১০২ বিবিসি, ২৫ অক্টোবর, ২০২৩

পশুতত্ত্ব ও বর্ণবাদ

তারপর হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন নেতানিয়াহু। নির্বিচার আক্রমণ চলতে থাকল শিশু-নারী ও সাধারণ মানুষের ওপর। চারদিক থেকে অবরুদ্ধ গাজা। সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে তাকে। সব ধরনের মানবিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত সেখানকার মানুষ। খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসাব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেটসহ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করেছে ইসরাইল। বিরতিহীন জল, স্থল ও আকাশপথে চালাচ্ছে নির্মম, বর্বর গণহত্যা। বোমাবর্ষণে নিমেষে ছাই হয়ে যাচ্ছে শিশু, নারী, সাধারণ মানুষ। ধ্বংসস্তূপ হচ্ছে বাসভবন, তাতে চাপা পড়ে উদ্ধারহীন অবস্থায় মারা যাচ্ছে হাজারো প্রাণ। ইসরাইলি বোমাবর্ষণে ধ্বংস হচ্ছে শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জা, হাসপাতাল। ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর নির্দেশে ফিলিস্তিনিরা যখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দলে দলে ছুটছে, তখন বিমান থেকে তাদের ওপর ফেলা হচ্ছে নিষিদ্ধ ফসফরাস বোমা। চালানো হচ্ছে জাতিগত নিধন। ১৪ নভেম্বর অবধি প্রাণ হারিয়েছে কমপক্ষে ১২ হাজার। জাতিসংঘের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংস্থা ইউএনএফপিএ'র হিসাব মতে, গাজায় হতাহতদের মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু।

ইউরো-মেড হিউম্যান রাইটস মনিটর অনুসারে, ইসরাইল ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ২৫ হাজার টনের বেশি বিস্ফোরক ফেলেছে, যা দুটি পরমাণু বোমার সমান।

এই যে ধ্বংসযজ্ঞ, এটা কি পাশবিকতা নয়?

না, ইসরাইলের জবাব হচ্ছে, না। কারণ কী? ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বললেন, 'আমি গাজা উপত্যকা পুরোপুরি অবরোধের নির্দেশ দিয়েছি। কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ থাকবে না, খাদ্য প্রবেশ করতে পারবে না এবং কোনো জ্বালানি সরবরাহ হবে না। সবকিছু বন্ধ থাকবে। আমরা মানুষরূপী পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করছি এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

হ্যাঁ। পশুদের সাথে তো পশুর মতো আচরণই করতে হবে। অতএব পাশবিকতা ও বর্বরতাটাই ফিলিস্তিনিদের পাওনা, এটাই তাদের জন্য ন্যায়। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা কেন মানুষ নয়? তারা মানুষ নয় ইহুদি বিশ্বাসের বিচারে। ইহুদি আইন ব্যবস্থায় অ-ইহুদিকে কোনো পরিস্থিতিতেই মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় না।[১০৩] এখানে নৈতিকতার কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ অ-ইহুদিদের সঙ্গে লেনদেন ও আচরণে ইহুদিগণ নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসনমুক্ত।[১০৪]

এখানে ন্যায়বিচার, মানবতা, অধিকার ও দয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ ন্যায়বিচার, দয়া বা মানবিকতার যা কিছু ইহুদি আইনে রয়েছে, তা শুধু ইহুদিদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অ-ইহুদিগণের ক্ষেত্রে সামাজিক সুবিচার বা দয়া-দাক্ষিণ্য কিছুই প্রযোজ্য নয়। ইহুদি ধর্মীয় অনুশাসনের বিচারের ধারণা ইহুদি সমাজের সীমান্তে এসে থেমে যেতে চায়। তোরাহের সামাজিক, বিচারিক, মানবিক অথবা দয়াশীলতার সকল বয়ান শুধু

---

১০৩ ইসরায়েলের পুত্রগণ, এম, ইদ্রিস আলী, ৪১ : ২৫৩

১০৪ Alam Unterman, Jews :Their Religious Beliefs and Practices, 1981, Routledge & Kegan paul p 227

ইহুদি ভাই বা প্রতিবেশীকে ঘিরেই। সেখানে শুধু ইহুদি ভাই বা প্রতিবেশীকে বোঝানো হয়েছে।[১০৫]

এটি শুধু যুদ্ধকালীন বাস্তবতা নয়, স্বাভাবিক ও নিয়মিত চিত্র। মুসলিম বা ফিলিস্তিনিদের সাথে ইসরাইলের এটাই আচরণবিধি। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট ঠিকই বলেছে, 'ইসরাইলের ভেতর এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে ইসরাইলের নীতি, আইন, আচরণ 'অ্যাপারথাইড' অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদের সমতুল্য। ইসরাইলের ইহুদিদের স্বার্থে ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতন এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখতে ইসরাইল রাষ্ট্র একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে।'

আন্তর্জাতিক আইনে এ ধরনের 'অ্যাপারথাইড' অর্থাৎ নির্যাতন এবং বৈষম্যমূলক আইনের মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীর ওপর অন্য জনগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।[১০৬]

---

১০৫ John Corrign, et al, Jews, Christians, Muslims, A Introduction to Monotheistic Comprative Religions, 1998 Prentice Hall p,291

১০৬ বিবিসি, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বর্বরতা ও বেঁচে থাকা

এই বর্বর রেসিজমে পশ্চিমাদের কোনো আপত্তি নেই। শুধু আছে বিরতিহীন, শর্তহীন ও মাত্রাহীন সহায়তা। তাদের নিরন্তর শ্লোগান হলো ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের জীবনের অধিকার কি অধিকার নয়? তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার অধিকার কি অধিকার নয়?

ফিলিস্তিনি ভূমি ইসরাইলিদের মাতৃভূমি নয়। তারা এখানে দখলদার। ইহুদিবাদী রাষ্ট্র যে লিগ্যাসি দাবি করে, সেটা তোরাহ্ ও ইতিহাসবাহিত। কিন্তু আমরা দেখেছি তোরাহ্ যেমন তাদেরকে ফিলিস্তিনি ভূমিতে বৈধতা দেয় না, তেমনি ইতিহাস তাদের হাতে দেয় না দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার যুক্তি। ফলে একটা রাষ্ট্রের মূলভিত্তি যে বৈধতা, ইহুদিবাদী রাষ্ট্রের সেই বৈধতা কোথায়? তার অস্তিত্ব কেবল শক্তির যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র জবর-দখলনির্ভর উপনিবেশ ও নব্য ক্রুসেডীয় দুর্গ ছাড়া আর কী?

কিন্তু এই ঔপনিবেশিক ও ক্রুসেডীয় পাপের পাশে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব। ফিলিস্তিনের জনগণ ও লড়াকুরা এখানে বলতে গেলে একা।

মাহমুদ দারবিশ বলেছিলেন,

'পৃথিবী আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে
আমাদের ঠেসে ধরছে একেবারে শেষ কোণায়
এই অত্যাচার সহ্য করতে আমরা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ছিঁড়ে ফেলব
দুনিয়া আমাদেরকে গ্রাস করছে।[১০৭]

১০৭ মাহমুদ দারবিশ : হয়ার শুড দ্য বার্ডস ফ্লাই আফটার দ্য লাস্ট স্কাই?

দুনিয়াকে ফিলিস্তিন নিজের মা ভেবেছিল। কিন্তু তার সাথে দুনিয়া হৃদয়হীন 'সৎ মা'র আচরণ করছে, কোনো ইনসাফ বরাদ্দ রাখছে না। ফিলিস্তিনের জন্য না থাকছে কোনো আকাশ, না কোনো সীমানা। অতএব কবির প্রশ্ন,

'শেষ সীমানায় ঠেকে গেলে যাবোটা কোথায়?
শেষ আসমানের পরে পাখিগুলো উড়বে কোথায়?'[১০৮]

অ্যাডওয়ার্ড সাঈদের একটা বই নিজের নাম ধার করেছিল এই কবিতা থেকে। বইটি হলো 'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'। এতে আছে ভূমিহীন, দুর্গত, নির্বাসিত মানুষের কথা, যাদের পরিচয়কে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বেঁচে থাকাকে করা হয়েছে বেঁচে না থাকার অধিক যন্ত্রণাদায়ক। যাদের জীবন অনিশ্চিত, অস্তিত্ব ধ্বংসোন্মুখ, শ্বাস-প্রশ্বাস অবরুদ্ধ, বেঁচে থাকার সকল মাত্রার ওপর সেন্সর। সাঈদ প্রশ্ন তুলেছেন, আমরা কি বেঁচে আছি? এর পক্ষে আমাদের কোনো প্রমাণ আছে? হ্যাঁ, প্রমাণ আছে। শিলাদৃঢ় ইমান আর হার না মানা স্বাধিকার সংগ্রাম হলো এর প্রমাণ। কিন্তু প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস, ফিলিস্তিন ও মানবতার এই দুর্গত, বিপন্ন দুঃসময়ের নীরব দর্শক মুসলিম বিশ্ব কি আদৌ বেঁচে আছে? মানুষ হিসেবে এই পরিস্থিতিতে আমাদের বিবেকের বেঁচে থাকার প্রমাণ কী?

---

১০৮ মাহমুদ দারবিশ : প্রাগুক্ত